সরল প্রাণ বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য

3373

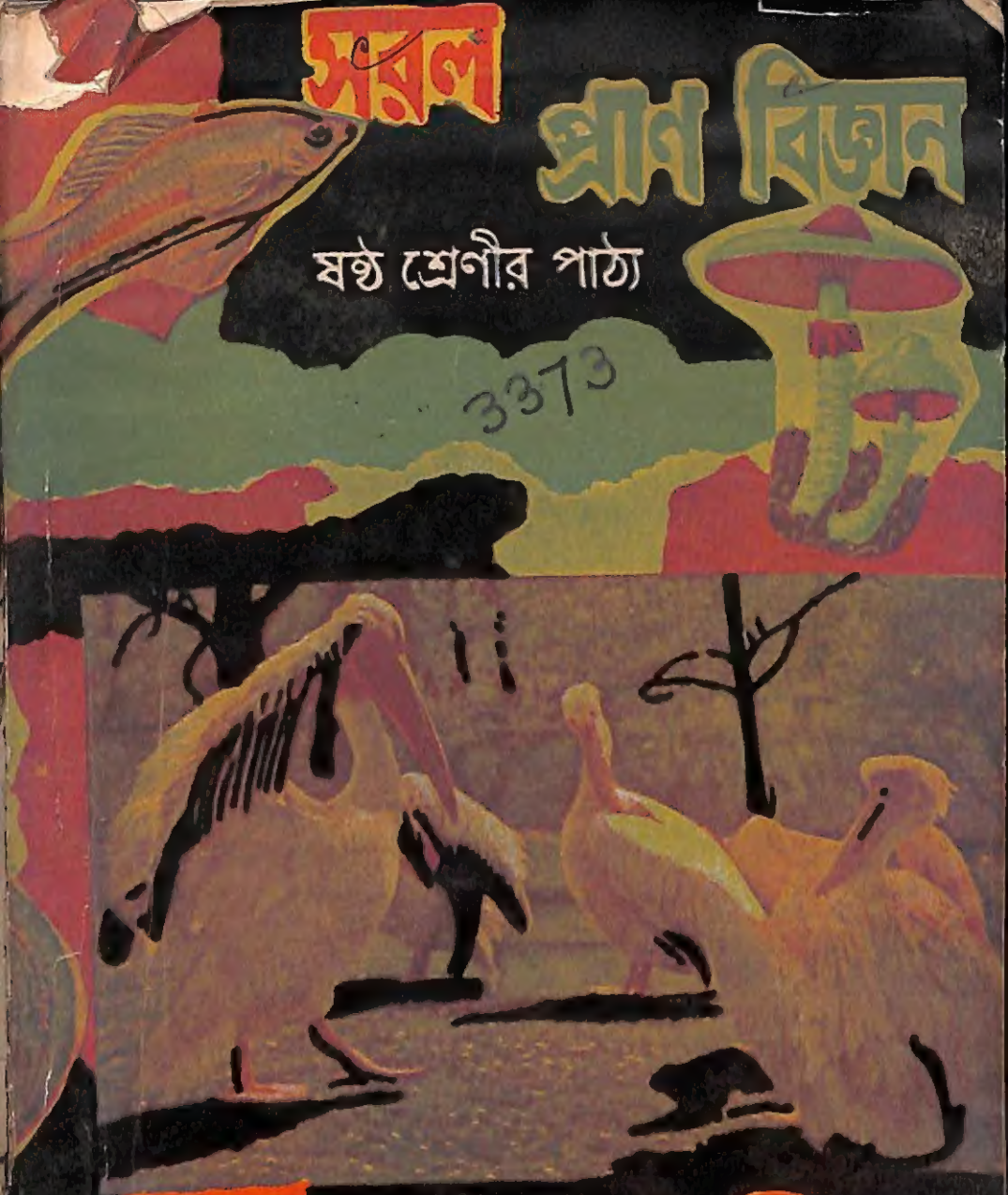

রবীন্দ্র নারায়ণ পাল
সুপ্রকাশ রায়চৌধুরী

This book was taken from the Library of Extension Services Department on the date last stamped. It is returnable within 7 days .

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ১৯৭৪ সাল হইতে প্রবর্তিত নূতন পাঠ্যক্রম অনুসরণে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত।

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education
Vide Notification TB/74/VI/LS/30 Dated 24. 11. 75.

সরল প্রাণবিজ্ঞান

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ পাল, এম. এস্-সি,
বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদবিদ্যা, শ্রীচৈতন্য কলেজ

ও

ডঃ সুপ্রকাশ রায়চৌধুরী, এম, এস্-সি, পি-এইচ ডি,
বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বঙ্গবাসী কলেজ (সান্ধ্য)

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN.
3373
Deptt of Extension Services.
22.3.76
CALCUTTA-27

এ্যালায়েড বুক এজেন্সী
পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
১৮/এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

This book was taken from the Library of Extension Services Department on the date last stamped. It is returnable within 7 days .

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ১৯৭৪ সাল হইতে প্রবর্তিত নূতন পাঠ্যক্রম অনুসরণে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত।

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education Vide Notification TB/74/VI/LS/30 Dated 24. 11. 75.

সরল প্রাণবিজ্ঞান

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ পাল, এম. এস্-সি,
বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদবিদ্যা, শ্রীচৈতন্য কলেজ

ও

ডঃ সুপ্রকাশ রায়চৌধুরী, এম. এস্-সি, পি-এইচ ডি,
বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বঙ্গবাসী কলেজ (সান্ধ্য)

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
3373
Deptt of Extension Services.
22.3.76
CALCUTTA-27

এ্যালায়েড বুক এজেন্সী
পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
১৮/এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
কে, সরকার
এ্যালায়েড বুক এজেন্সী
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৭৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
তৃতীয় সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৭৫
চতুর্থ সংস্করণ—১৯৭৬

মূল্য : চার টাকা তিরিশ পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী
লোকসেবক প্রেস
৮৬-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,
কলিকাতা-১৪

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পরিবর্তনশীল জগৎ। পরিবর্তন আসে—আমরা তাকে স্বাগত জানাই। এর জন্য নিজেকে মানিয়ে নিই। এটাই জীবের ধর্ম। নানান পরিবর্তনের মাঝে শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের বীজ সবে মাত্র অঙ্কুরিত হয়েছে। তা থেকে কেমন ফল জন্মাবে তা নিয়ে এখন চিন্তিত হবার দরকার নেই--ভবিষ্যতের জন্যেই তা তোলা থাক্। আমরাও এখন শুধু অঙ্কুরিত গাছে জল, খাদ্য দিয়ে আর তার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে তার বৃদ্ধি লক্ষ্য করব। নতুন পাঠক্রম ছাত্রের ভেতর-বাইরে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করবে, তার চিন্তাধারাকে বিকশিত করবে এ আশা আমরা করতে পারি। সেজন্যে অনেকের মাঝে আমরাও যথেষ্ট যত্ন ও শ্রম দিয়ে ভরিয়ে তোলা **'সরল প্রাণবিজ্ঞান'** তাদের হাতে দিলাম। ভালমন্দের বিচারক তারাই আর তাদের শিক্ষকরা। যে দ্রুততায় আমাদের কাজ শেষ করতে হয়েছে তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এগুলোর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পাঠকদের অনুরোধ জানাই। পরবর্তী সংস্করণে তাঁদের ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব।

এই সঙ্গে একটা কথা জানান প্রয়োজন মনে করি যে, পর্ষৎ-এর নির্দেশ অনুসারে আমরা **রাজশেখর বসু ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রচিত পরিভাষাই** কেবল ব্যবহার করেছি। যে শব্দের পরিভাষা এঁরা উল্লেখ করেন নি, তা আমরা নির্দেশমত বাংলা হরফে যথাযথ রেখেছি। প্রসঙ্গত বলি, সিলেবাসে প্রশ্ন সম্বন্ধে আগের সিলেবাসের মত কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সহিত পরিচিত হওয়ার উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে আমরা প্রতি অধ্যায়ের শেষে সাধারণ ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দিয়েছি। এর ফলে বইয়ের কলেবর সামান্য বৃদ্ধি হয়েছে। আশা করি এর যৌক্তিকতা নিশ্চয়ই বিবেচিত হবে।

পরিশেষে প্রকাশক সংস্থা "এ্যালায়েড বুক এজেন্সী"র স্বত্বাধিকারী ও কর্মীবৃন্দ যাঁরা এই বইয়ের প্রকাশের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাঁদের জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে বইটি গ্রহণযোগ্য হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ পাল
শ্রীসুপ্রকাশ রায়চৌধুরী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অত্যন্ত আনন্দের কথা, আমাদের বইটি শিক্ষাবিদ্‌দের সমাদর লাভ করেছে। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বইটির ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের সুযোগ পেলাম।

ছাত্র-ছাত্রীর সুবিধার দিকে নজর রেখে এই সংস্করণে বইটির কিছু পুনর্বিন্যাস করা হল। ইতিমধ্যে আমরা অগনতি শুভানুধ্যায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে কিছু কিছু গঠনমূলক সমালোচনা পেয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা ঋণী। ভবিষ্যতে বইটিকে আরও সুন্দর করে তুলতে প্রত্যেকের সহযোগিতা কামনা করি।

জানুয়ারি, ১৯৭৪

গ্রন্থকারদ্বয়

উৎসর্গ

শুভাশিস, স্বাতী, বর্ণালী ও পিয়ালীকে—

SYLLABUS

Class VI 100 pages (50 pages—reading-matter and 50 pages illustrations and diagrams. Printing—Pica type, size of the book 1/16 double demy, size of the diagram 3"×2' minimum).

1. Student and his environment. (10 pages)

2. Acquaintance with various living and nonliving forms of their own environment. Popular names of common life forms—plants and animals. Popular names and general idea about (a) lotus (b) mango (c) national bird (peacock) (d) national animal (tiger). (20 pages)

3. Observation of living objects with an eye to the training of the sense organs of the student leading to general inference. (25 pages)

4. Observation of living objects through simple xperiments :—requirement of light, air (Oxygen), water and nutrients for their existence. (25 pag

5. Basic external structure in (a) plant.....example (pea), (b) animal.....(fish and man). (20 pages)

N. B. :—Field excursion (at least 15) will have to be arranged so that the students may have direct idea about plants and animals in their own environment.

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। ছাত্র ও তার পরিবেশ	...	১
(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ	...	৩
(খ) জৈব পরিবেশ	...	১২
(গ) সামাজিক পরিবেশ	...	১৫
সাধারণ প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা	...	১৭-১৮
২। নিজ পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার জীব ও জড়ের সহিত পরিচিতি		১৯
গাছপালার সহিত পরিচয়	...	২৪
পশুপাখীর সঙ্গে পরিচয়	...	৩১
(ক) পদ্ম	...	৩৫
(খ) আম	...	৩৭
(গ) জাতীয় পাখী ময়ূর	...	৩৯
(ঘ) জাতীয় পশু বাঘ	...	৪২
সাধারণ প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা	...	৪৪-৪৫
৩। ছাত্রের ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত	...	৪৬
(ক) দেখে শেখা	...	৪৬
(খ) শুনে শেখা	...	৬২
(গ) শরীরের স্পর্শ দিয়ে শেখা	...	৬৩
(ঘ) শুঁকে শেখা	...	৬৪
(ঙ) জিভের স্বাদে শেখা	...	৬৫
সাধারণ প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা	...	৬৬
৪। সহজ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবকে পর্যবেক্ষণ	...	৬৮
আলোর প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা	...	৬৮
প্রাণীর ক্ষেত্রে আলোর প্রয়োজনীয়তা	...	৭১

বিষয়		পৃষ্ঠা
আলোর অন্য প্রয়োজনীয়তা	...	৭২
বাতাস বা অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা	..	৭৪
জলের প্রয়োজনীয়তা	...	৭৬
জলের প্রয়োজনীয়তায় পরীক্ষা	...	৭৮
খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা	...	৮১
সাধারণ প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা	...	৮৩
৫। বহিরাকৃতি	..	৮৪
উদ্ভিদ (মটর গাছ)	...	৮৪
মাছ	...	৮৮
মানুষ	...	৯০
সাধারণ প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা	...	৯৫-৯৬

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN.
Deptt of Extension Services.
CALCUTTA-27

১ | ছাত্র ও তার পরিবেশ
[Student and his environment]

পাখীর কিচিরমিচির আর তাদের মিঠে গলার আওয়াজে রাতের ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে পুব আকাশে দেখলে মায়ের কপালে সিঁদুরের টিপের মত জেগে উঠেছে সুয্যিমামা। তার আভায় সারা আকাশ জুড়ে নানা রংয়ের লুকোচুরি। আস্তে আস্তে ঝলমল করে উঠল সোনাঝরা রোদ্দুর। প্রকৃতি যেন হাসছে। দু'হাতে মুঠো মুঠো অজানা ধনদৌলত বিলিয়ে দেবার জন্যে যেন বলছে—ওঠো জাগো, আর ঘুমিয়ে থেক না।

শহরে আর গ্রামে প্রকৃতির রূপ আলাদা। গ্রামে আছে খোলা মেলা মাঠ। আর নানা রংয়ের বাহারে সুন্দর সব পাখী। প্রকৃতিকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে নানা রংয়ের গাছ-গাছালি। কেউ তাদের যত্ন করে না। তবু তারা বেড়ে ওঠে অযত্নে, অনাদরে। ফুল, ফল সাজিয়ে কাছে ডাকে অচেনা অতিথিকেও। সেখানে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। মনের আনন্দে মাঠের মধ্যে বা নদীর ধার দিয়ে গান গাইতে গাইতে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যায় খুশীমত! পরিচিত হওয়া যায় জানা-অজানা কত রকমের পাখীর সঙ্গে; যারা তাদের নিজের পরিবেশে থেকে গ্রামের আকাশ-বাতাস মুখর করে তোলে। এদিকে গরুর পাল মাঠে নামে। চাষী তার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সবুজ মাঠটায়—যেখানে ফসলের ঢেউ উঠেছে, কচি কচি মাথা নেড়ে চাষীকে কাছে ডাকছে। আর ওদিকে দীঘির টলটলে জলে কেমন শামুক, পদ্ম হাসছে! তারই মাঝে ছুটোছুটি করছে হাঁসের দল। এই হল গাঁয়ের পরিবেশ; এখানে জীবন সহজ ও সরল। সরলতাই গাঁয়ের মানুষকে একে অন্যের কাছে টানে, যা শহরে তেমন চোখে পড়ে না। গাঁয়ের পরিবেশ আর শহরের পরিবেশের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। গাঁয়ের আর শহরের মানুষ দেখলে তফাৎটা সহজেই চোখে পড়ে। কেননা পরিবেশ যে সকলের উপরে নিজের ছাপ রেখে দেয়।

তাহলে পরিবেশ বলতে কি বোঝা গেল? চারপাশের আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, গাছপালা, পশুপাখী এদের নিয়েই পরিবেশ। জীবনের একটা লক্ষণ হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। তুমি জীবজগতের

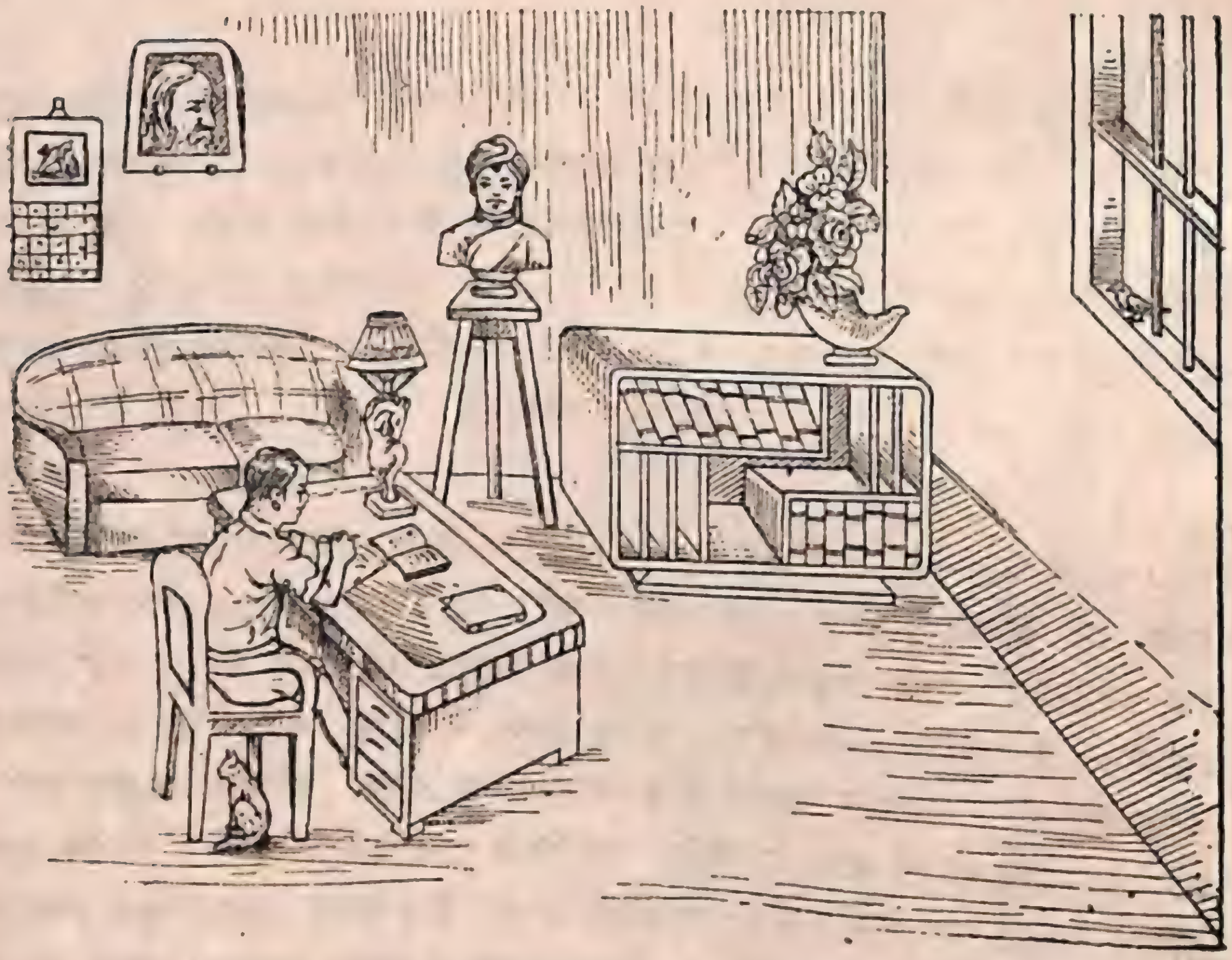

চিত্র ১ঃ শান্ত পরিবেশে ছাত্র একমনে পড়াশুনা করছে।

মধ্যমণি। তুমি চাইবে পরিবেশের সুযোগগুলো নিয়ে অসুবিধাগুলো ত্যাগ করতে। **তাই বুঝতে হবে পরিবেশের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি, কেমন করেই বা পরিবেশকে নিজের করে নিয়ে তুমি বেঁচে আছ।** তোমার আর তোমার মত জীবজগতের বাসিন্দা গাছপালা, পশুপাখীকেও দু'রকম পরিবেশে বাঁচতে হয়। প্রথমটা হচ্ছে **প্রাকৃতিক পরিবেশ** আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে **জৈব পরিবেশ**। এস, এখন আমরা এ দু'টোর সঙ্গে পরিচিত হই।

প্রাকৃতিক পারিবেশ

আলো, বাতাস, জল ও মাটি এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে প্রকৃতি। প্রকৃতি মা'র মত। মা যেমন সন্তানকে পালন করেন আমরাও তেমনি প্রকৃতির কোলে মানুষ হচ্ছি। আমাদের জীবনী শক্তির মূল উৎস এই প্রকৃতি। প্রকৃতি আমাদের চারদিকে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা হ'ল প্রাকৃতিক পরিবেশ। এখন এই প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীবকুলের উপর তার প্রভাবের সঙ্গে আমরা পরিচিত হব।

আলো

পূব আকাশে আলোর পরশ পেয়ে রাতের আঁধার কেটে যায়। নূতন উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে তুমি তোমার দিনের কাজ আরম্ভ কর। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছো সূর্যালোক না পেলে তোমার দশা কি হত? পৃথিবীর অধিকাংশ জীবের প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যেত। কারণ, সূর্যই আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস। কথাটা হয়ত ঠিক বুঝতে পারলে না। একটু আলোচনা করলেই বুঝবে, কেন **সূর্য আমাদের জীবনের উৎস।** আমরা রোজ যে সমস্ত খাদ্য খাই তা থেকেই পাই কাজ করবার শক্তি। একদিন খাদ্য না পেলে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি, আমাদের কাজ করবার শক্তি হারাই। আমাদের প্রধান খাদ্য গাছপালা বা অন্য প্রাণী। শুধু গাছের ফুল, ফল, পাতা, শিকড়, কান্ড প্রভৃতি খেয়েও বাঁচা যায়। তবে আমরা সেইসঙ্গে প্রাণীর মাংসও গ্রহণ করি। যে সমস্ত প্রাণী আমরা খাই তারা কি খেয়ে বাঁচে সে চিন্তা কখনও করেছো কি? গাছপালা খেয়েই তারা বেঁচে থাকে আর তাদের খেয়েই তুমি বেঁচে আছ। তাহলে একথা বলা চলে যে, **গাছপালাই প্রাণীর খাদ্যের মূল উৎস।** কিন্তু গাছপালাকেও তো বেঁচে থাকতে হবে। বাঁচতে গেলে তাদেরও খাদ্যের প্রয়োজন। সেই খাদ্য এরা কোথা থেকে পায়? তোমরা জেনে রাখ গাছপালার খাদ্য তৈরী করার বিশেষ এক ক্ষমতা আছে, প্রাণীর তা নেই। গাছের খাদ্য তৈরী করতে, প্রধান ভূমিকা নেয় পাতা। **পাতা হল এদের রান্নাঘর।** নিশ্চয়

চিত্র ২ ঃ সূর্য আমাদের জীবনের উৎস
সূর্য জাগার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত প্রকৃতি জেগে ওঠে।

লক্ষ্য করেছো অধিকাংশ গাছের পাতার রং সবুজ। একরকম সবুজ কণার উপস্থিতির জন্যেই পাতার ঐ রং। এই সবুজ কণাগুলিকে বিজ্ঞানীরা ক্লোরোফিল বলেন। উদ্ভিদের সমস্ত সবুজ অংশেই ক্লোরোফিল থাকে। এই ক্লোরোফিলের কাজ কি? গাছ মাটি থেকে মূলের সাহায্যে জল শুষে নেয়। কাণ্ডের মধ্য দিয়ে সেই জল পাতায় আসে। এদিকে পাতা তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বায়ু থেকে কার্বন ডায়ক্-সাইড টেনে নেয়। এখন এই জল ও কার্বন ডায়ক্সাইড থেকে পাতার সবুজ কণা সূর্যালোকের সাহায্যে গাছের দেহে **শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরী করে।** এই সময় অক্সিজেনও তৈরী হয়। অক্সিজেন পাতার ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে বাতাসে মেশে। শর্করাজাতীয় খাদ্য গাছের বিশেষ বিশেষ অংশে জমা থাকে। তাই যদিও উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত করবার বিশেষ ক্ষমতা আছে, তবুও খাদ্য প্রস্তুতের জন্যে তাকে নির্ভর করতে হয় সূর্যের আলোর উপর। কেননা দিনের বেলাতেই কেবল গাছ ঐ খাদ্য তৈরী করতে পারে। **তাই একথা বলা যায় যে সূর্য আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস।**

চিত্র ৩ ঃ গাছকে সূর্যের উপর নির্ভর করতে হয়। দেখ গাছটি কেমন সূর্যের দিকে হেলে যাচ্ছে।

উষ্ণতা

প্রাকৃতিক উষ্ণতার প্রধান উৎস সূর্য। সূর্যালোক পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে পড়ে না। তাই পৃথিবীর সর্বত্র উষ্ণতা এক নয়। তাছাড়া ঋতুভেদেও উষ্ণতার পরিবর্তন হয়।

আমাদের পরিবেশে উষ্ণতার তারতম্য লক্ষ্য করার মত আমাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতিও এর সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। শীতকালে শীতের হাত থেকে বাঁচতে আমরা গরম জামাকাপড় ব্যবহার করি; সারা দেহকে ঢেকে রাখি, যাতে

আমাদের দেহের তাপ বাইরে বেরিয়ে না যায়। আবার গরমের সময় শরীর ঠাণ্ডা রাখতে পাখার বাতাস খাই, ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। সেই সঙ্গে চড়া রোদের হাত থেকে বাঁচতে ছাতাও ব্যবহার করতে হয়।

প্রাণীর দেহের যন্ত্রগুলিকে চালু রাখতে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতার দরকার। তোমার গায়ে হাত দিলে অথবা থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করলে ঐ নির্দিষ্ট উষ্ণতা অনুভব করতে পারবে। সব প্রাণীর ক্ষেত্রে এই উষ্ণতা একরকম নয়। পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রতিটি প্রাণী তাদের দেহের নির্দিষ্ট একটা উষ্ণতা সব সময় রক্ষা করে চলে। বাইরের উষ্ণতার তারতম্য হলেও এদের দৈহিক উষ্ণতায় পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এরা ছাড়া অন্য কোন প্রাণিদেহের মধ্যে নির্দিষ্ট উষ্ণতা রক্ষা করতে পারে না। তাই পরিবেশ অনুযায়ী এদের দেহের উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। এদিকে আবার সকল গাছ যে এক রকমের উষ্ণতা সহ্য করবে তা নয়। সেজন্যে বিভিন্ন উষ্ণতার পরিবেশে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আমরা নানা ধরনের প্রাণী ও গাছপালা দেখতে পাই।

বাতাস

বাতাসকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। কিন্তু বাতাসের প্রভাব আমরা সব সময় অনুভব করি! একটা বন্ধঘরের ভেতরে কিছুক্ষণ থাকলে তুমি অস্বস্তি বোধ কর, অসুস্থ হয়ে পড়। কিন্তু মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে এলেই আবার সুস্থ হয়ে ওঠ। তার কারণ বাতাস ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না। বাঁচার জন্যে যেমন খাদ্য না হলে চলে না তেমনি প্রয়োজন বাতাসের। বাতাস থেকেই আমরা পাই অক্সিজেন। আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে অবিরাম অক্সিজেন টানি আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে দূষিত কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাস ছেড়ে দিই। এর নাম শ্বসন। প্রতিটি জীবের মধ্যে বিরামহীনভাবে শ্বসন চলছে। শ্বসন বন্ধ মানেই মৃত্যু। স্থলচর প্রাণীর শ্বসন কাজ চলে বাতাসেই। জলচর প্রাণী জলে মিশে থাকা অক্সিজেন গ্রহণ করে বটে কিন্তু জলের সঙ্গে যে অক্সিজেন মিশে থাকে তা বাতাসেরই অক্সিজেন। পৃথিবীর কোন স্থান বায়ুশূন্য নয়। তাই জীবকুল বেঁচে আছে। কিন্তু অনবরত জীবজগৎ প্রকৃতির এই বায়ু থেকে অক্সিজেন টেনে কার্বন ডায়ক্সাইড ত্যাগ করতে থাকলে প্রকৃতির ভাণ্ডার অক্সিজেন শূন্য হয়ে কার্বন ডায়ক্সাইডে পূর্ণ হয়ে

উঠবে এটাই স্বাভাবিক। ফলে অক্সিজেনের অভাবে জীবকুলের মৃত্যু ঘটবে। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটছে না। তার কারণ তোমরা আগেই জেনেছো যে গাছপালা খাদ্য তৈরী করার সময় বাতাস থেকে কার্বন ডায়ক্সাইড টেনে নেয় আর সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। **এইভাবে প্রকৃতির ভাণ্ডারে অক্সিজেন ও কার্বন ডায়ক্সাইডের সমতা রক্ষা হয়ে থাকে।** প্রকৃতির ভাণ্ডার অফুরন্ত থেকে যায়। আর আমাদের জীবন ধারণের সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠে। একথাও জেনে রাখ, **পরিবেশ সৃষ্টিতে বাতাসের চাপের প্রভাবকে অবহেলা করা যায় না।** বিভিন্ন উচ্চতায় বাতাসের চাপের হেরফের হয়। শ্বসনের কথাই ধর না। সমতলে এই প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছন্দ হলেও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩,০০০/ ১৪,০০০ ফিটের উপরে যতই উঠা যায় ততই শ্বাসকষ্ট হয়। কারণ, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমশঃ কমতে থাকে। এই অক্সিজেনের অভাব পূরণের জন্যে উঁচু পাহাড়ের বাসিন্দাদের হৃৎপিণ্ড বড় হয় আর লোহিত কণিকার সংখ্যাও বেড়ে যায়।

জল

জল আমাদের পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জল ছাড়া আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন কল্পনা করতে পারি না। **জল ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না।** পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। **জীবের প্রথম সৃষ্টি জলেই।** এখনও জলে বহু জীবের বাস। জল ছেড়ে যে সব প্রাণী স্থলে এসেছে, বাতাসে উড়ছে, মাটির মধ্যে রয়েছে তারাও কিন্তু জলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারেনি। কারণ, আমাদের খাদ্যের প্রধান অংশই জল। জলে মিশে থাকা বহু **খনিজ পদার্থ** ও লবণ গ্রহণ করে আমরা কতকাংশে দেহের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাই; আমাদের শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখি। **তাই জলের আর এক নাম জীবন।** শরীরে জলের অভাব হলেই তা অনুভব করতে পারি। জলের অভাববোধকে তৃষ্ণা বলি। জল পান করলে তবেই তৃষ্ণা দূর হয়, আর দেহের জলের প্রয়োজন মেটে। দেহের পক্ষে যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন তার

থেকে বেশী পরিমাণ জলই আমরা পান করি। এই অতিরিক্ত জল আমরা দেহের ভেতর রাখি না। ঘাম, মল, মূত্র ও নিঃশ্বাসের সঙ্গে তা বেরিয়ে যায়। শরীরের দূষিত পদার্থ এই অতিরিক্ত জলের সঙ্গে বেরিয়ে যায় বলেই শরীর সুস্থ ও সবল থাকে।

চিত্র ৪ : জল ছাড়া গাছ বা প্রাণী কেহই বাঁচে না।

গাছের পক্ষেও জল ছাড়া খাদ্য গ্রহণ করা অসম্ভব। কারণ, গাছের বাঁচার জন্যে যে সব উপাদান দরকার তার বেশীর ভাগই গাছ মাটি থেকে তরল অবস্থায়

শুষে নেয়। বাড়তি জল গাছের পাতার ছিদ্র দিয়ে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। এইভাবে গাছের মধ্যেও জলের একটা স্রোত বয়ে চলেছে। (চিত্র ৫)

চিত্র ৫ : গাছের মধ্যে জলের স্রোত

প্রকৃতির এই জল গাছপালা আর প্রাণীরা অবিরত গ্রহণ করছে। সূর্যের তাপেও জল নিয়ত বাষ্পে পরিণত হচ্ছে। এইভাবে অনন্তকাল ধরে জল খরচ

হতে থাকলে পৃথিবীর জল শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা হচ্ছে না। কেননা তাপে জল বাষ্প হয়ে উপরে ওঠে আর ছোট ছোট জলকণায় জমাট বেঁধে মেঘের সৃষ্টি করে। সেই মেঘ থেকে হয় বৃষ্টি। বৃষ্টির জলে নদী-নালা আবার পূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে জল থেকে বাষ্প, বাষ্প থেকে মেঘ, আবার মেঘ থেকে জল; কি সুন্দরভাবে এরা ঘুরে চলেছে চাকার মত!

মাটি

মাটির সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ। মাটিও আমাদের পরিবেশ সৃষ্টি করে। মাটির ফসলই আমাদের বাঁচার রসদ যোগায়। কারণ অধিকাংশ গাছই মাটিতে জন্মায়। মাটি থেকেই নানারকম খনিজ শুষে নিয়ে উদ্ভিদ পুষ্ট হয়। তাইতো তোমরা বাগানে গাছ পুঁতে বেশী করে তার গোড়ায় মাটি দাও। নিশ্চয়

চিত্র ৬ ঃ জমিতে সার ছিটান হচ্ছে

লক্ষ্য করেছো সব মাটিতে সব রকমের গাছ সমানভাবে হয় না। কারণ সব গাছের দরকারী উপাদানগুলো সমানভাবে সব মাটিতে থাকে না। তাইতো সার দিয়ে মাটি তৈরী করে তবেই গাছপালা বসাতে হয়।

শুধু গাছপালা নয় বহু প্রাণীও মাটি থেকে সোজাসুজি তাদের খাদ্য গ্রহণ করে, এমনকি মাটির মধ্যেই বাস করে। নিশ্চয় তোমাদের বাগানে কেঁচো আছে। এই কেঁচোর খাদ্য মাটি। এরা মাটি খায় আর মাটিকেই মলরূপে ত্যাগ করে। বাগানে মাটির কুণ্ডলী থেকেই কেঁচোর উপস্থিতি বুঝতে পারবে। দেখা গেছে প্রায় তিপান্ন হাজার কেঁচো এক একর জমিতে বাস করে। কেঁচোর মত অনেক প্রাণীই মাটিতে বাস করে—যেমন, উই, পিঁপড়ে ও নানা কীট-পতঙ্গ। মাটিতেই গর্ত করে বাস করে খরগোস, ছুঁচো, সাপ ইত্যাদি। আর আমরা এই মাটির উপর ঘর করেই বাস করি। মাটিই আমাদের বাসস্থান, মাটিই আমাদের অন্নদাতা, আমাদের নিত্য পরিবেশের অঙ্গ।

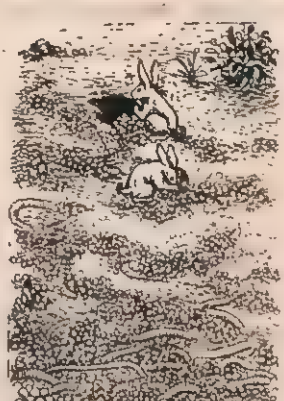

চিত্র ৭ : বাগানে কেঁচোর মেলা; খরগোস গর্ত করছে।

অভিকর্ষ

পরিবেশে অভিকর্ষ তুমি চোখে দেখতে না পেলেও সর্বদা এর প্রভাব তোমার উপর পড়ে। এর বলেই জীব জড় সব কিছুকেই পৃথিবী আকর্ষণ

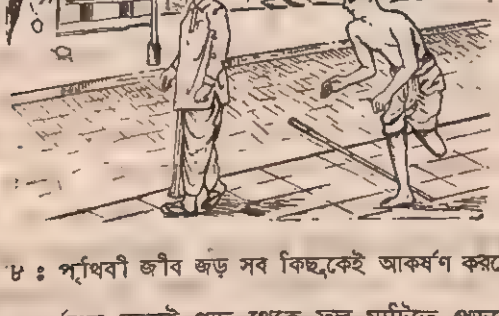

চিত্র ৮ : পৃথিবী জীব জড় সব কিছুকেই আকর্ষণ করছে।

করছে। এই আকর্ষণের ফলেই গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ছে, লাফ দিলে আমরা নিচে পড়ছি। হাঁটতে হাঁটতে ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছি।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WO
3373
Deptt of Extension
Services
22.3.76

পৃথিবীর এই আকর্ষণ না থাকলে পৃথিবীর সব কিছুই ছিটকে মহাশূন্যে চলে যেত, এই বিশ্বসংসার ধ্বংস হত। তাই পরিবেশে এই শক্তির প্রভাব আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

জৈব পরিবেশ

এতক্ষণ যে পরিবেশের কথা বলা হলো সে পরিবেশ কিন্তু প্রাণহীন। তুমি একটি প্রাণী। তোমার চারদিকে রয়েছে নানা প্রাণের স্পন্দন। এরা হলো জীব। তুমি হলে এদের মধ্যমণি। এই সব নিয়েই গড়ে উঠেছে জীবজগৎ। জীবজগৎ তোমার চারদিকে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা হলো জৈব পরিবেশ। এই জৈব পরিবেশ আমাদের অতি পরিচিত পরিবেশ, একান্ত নিজস্ব পরিবেশ।

পশুপাখী আর গাছপালা নিয়েই জৈব পরিবেশ। জৈব পরিবেশকে জানতে ও চিনতে নিশ্চয় তুমি উৎসাহী। তাইতো তুমি চিড়িয়াখানায় ছুটে যাও নানা প্রাণীকে দেখতে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাও গাছের সঙ্গে পরিচিত হতে। কিন্তু নিজের বাড়ীর পরিবেশে যে সব প্রাণী রয়েছে, তোমার বাগানে যে সব গাছপালা রয়েছে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখেছো কি? কখনও চিন্তা করেছো তারা তোমার পরিবেশের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে? এসো তাদের সংগে পরিচিত হই। নিজের পরিবেশকে চিনি।

প্রাণিজগৎ—তোমার গৃহ পরিবেশের কথাই প্রথম ধরা যাক্। গৃহ পরিবেশের কথা বললে প্রথমেই তোমার মনে হবে মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কথা। কিন্তু শুধু এরাই তোমার গৃহের অধিবাসী নয়। তোমার বাড়ীতেই হয়ত আছে পোষা পাখী, বিড়াল, কুকুর, ভেড়া, গরু, মোষ, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি। কোন কোন বাড়ীতে হয়ত আছে হাতী, ঘোড়া, উটও। এরাও তোমার পরিবারভুক্ত। তোমার নিত্য জীবনের সাথী। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এরাও তোমার উপকার করে। তুমিও এদের উপকার কর। এদের বাদ দিয়ে তোমার জীবন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এইসব পোষা জীবজন্তু ছাড়াও তোমার পরিবেশে আরও অনেক প্রাণী আছে যারা তোমার নিত্য সহচর। সব বাড়ীতেই অথবা বাড়ীর আশপাশে পিঁপড়ে, আরশোলা, ইঁদুর, মাছি, মশা, টিকটিকি প্রভৃতি কত প্রাণী থাকে। তোমার বাড়ীর বাগানে কেঁচো, শামুক, বোলতা, মৌমাছি, প্রজাপতি, সাপ, ব্যাঙ নিশ্চয়

আছে। শামুক, ঝিনুক, নানারকমের মাছ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি জলজ প্রাণীতে আশপাশের পুকুর পূর্ণ। আর মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়ায় বা গাছের ডালে ডালে লাফালাফি করে রং-বেরংয়ের জানা-অজানা নানা পাখী আর প্রজাপতি। **এরাই সুন্দর করেছে আমাদের পরিবেশ। এদের অনেকেই আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে। অনেকেই আবার জীবন সংহারের কারণ হয়।**

বিশাল এই প্রাণী রাজ্য। জল, স্থল, আকাশ এদের বিচরণ ক্ষেত্র।

চিত্র ৯ ঃ আরশোলার উপরে ঝাপ দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্ত

আকৃতি-প্রকৃতিগত নানা পার্থক্যে এরা বৈচিত্র্যময়। এইরকম বহু প্রাণী নিয়েই আমাদের পরিবেশ। **এদের মধ্যে রয়েছে খাদ্য খাদকের সম্পর্ক।** একে অপরের খাদ্য। যেমন আরশোলা—পোকা-মাকড় টিকটিকির খাদ্য, আবার

পৃথিবীর এই আকর্ষণ না থাকলে পৃথিবীর সব কিছুই ছিটকে মহাশূন্যে চলে যেত; এই বিশ্বসংসার ধ্বংস হত। তাই পরিবেশে এই শক্তির প্রভাব আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

জৈব পরিবেশ

এতক্ষণ যে পরিবেশের কথা বলা হলো সে পরিবেশ কিন্তু প্রাণহীন। তুমি একটি প্রাণী। তোমার চারদিকে রয়েছে নানা প্রাণের স্পন্দন। এরা হলো জীব। তুমি হলে এদের মধ্যমণি। এই সব নিয়েই গড়ে উঠেছে জীবজগৎ। **জীবজগৎ তোমার চারদিকে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা হলো জৈব পরিবেশ।** এই জৈব পরিবেশ আমাদের অতি পরিচিত পরিবেশ, একান্ত নিজস্ব পরিবেশ।

পশুপাখী আর গাছপালা নিয়েই জৈব পরিবেশ। জৈব পরিবেশকে জানতে ও চিনতে নিশ্চয় তুমি উৎসাহী। তাইতো তুমি চিড়িয়াখানায় ছুটে যাও নানা প্রাণীকে দেখতে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাও গাছের সঙ্গে পরিচিত হতে। কিন্তু নিজের বাড়ীর পরিবেশে যে সব প্রাণী রয়েছে, তোমার বাগানে যে সব গাছপালা রয়েছে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখেছো কি? কখনও চিন্তা করেছো তারা তোমার পরিবেশের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে? এসো তাদের সঙ্গে পরিচিত হই। নিজের পরিবেশকে চিনি।

প্রাণিজগৎ—তোমার গৃহ পরিবেশের কথাই প্রথম ধরা যাক্। গৃহ পরিবেশের কথা বললে প্রথমেই তোমার মনে হবে মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কথা। কিন্তু শুধু এরাই তোমার গৃহের অধিবাসী নয়। তোমার বাড়ীতেই হয়ত আছে পোষা পাখী, বিড়াল, কুকুর, ভেড়া, গরু, মোষ, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি। কোন কোন বাড়ীতে হয়ত আছে হাতী, ঘোড়া, উটও। এরাও তোমার পরিবারভুক্ত। তোমার নিত্য জীবনের সাথী। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এরাও তোমার উপকার করে। তুমিও এদের উপকার কর। এদের বাদ দিয়ে তোমার জীবন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এইসব পোষা জীবজন্তু ছাড়াও তোমার পরিবেশে আরও অনেক প্রাণী আছে যারা তোমার নিত্য সহচর। সব বাড়ীতেই অথবা বাড়ীর আশপাশে পিঁপড়ে, আরশোলা, ইঁদুর, মাছি, মশা, টিকটিকি প্রভৃতি কত প্রাণী থাকে। তোমার বাড়ীর বাগানে কেঁচো, শামুক, বোলতা, মৌমাছি, প্রজাপতি, সাপ, ব্যাঙ নিশ্চয়

আছে। শামুক, ঝিনুক, নানারকমের মাছ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি জলজ প্রাণীতে আশপাশের পুকুর পূর্ণ। আর মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়ায় বা গাছের ডালে ডালে লাফালাফি করে রং-বেরংয়ের জানা-অজানা নানা পাখী আর প্রজাপতি। এরাই সুন্দর করেছে আমাদের পরিবেশ। এদের অনেকেই আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে। অনেকেই আবার জীবন সংহারের কারণ হয়।

বিশাল এই প্রাণী রাজ্য। জল, স্থল, আকাশ এদের বিচরণ ক্ষেত্র।

চিত্র ৯ ঃ আরশোলার উপরে ঝাপ দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্ত

আকৃতি-প্রকৃতিগত নানা পার্থক্যে এরা বৈচিত্র্যময়। এইরকম বহু প্রাণী নিয়েই আমাদের পরিবেশ। **এদের মধ্যে রয়েছে খাদ্য খাদকের সম্পর্ক।** একে অপরের খাদ্য। যেমন আরশোলা—পোকা-মাকড় টিকটিকির খাদ্য, আবার

ইঁদুর—বিড়ালের খাদ্য। প্রাণিজগতের খাদ্য সংগ্রহের জন্যে বুদ্ধির খেলা চলছে। শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে কারুর আছে নখ, কারুর দাঁত বা বিষের থলি। কেউ কেউ ভয়াবহ আকৃতি, নানা ছল, বল, কৌশল অবলম্বন করে, আবার কেউ বা গাছের পাতার রংয়ের সঙ্গে রং মিলিয়ে আত্ম-রক্ষা করে। শুনলে আশ্চর্য হবে, অনেক প্রাণী অন্য প্রাণীর দেহের ভিতরে বা বাইরে অযাচিত অতিথি হিসাবে বাস করে আর খাদ্য সংগ্রহ করে। এই ধরনের প্রাণী হলো পরজীবী। এরা আশ্রয়দাতার কিছু উপকার না করে কেবল ক্ষতিই করে। কেউ কেউ, যেমন দু'টি প্রাণী (হারমিট ক্র্যাব ও সি অ্যানিমোন) বা দু'টি উদ্ভিদ (মটর গাছ ও ব্যাক্টিরিয়া) পরস্পর সহযোগিতার উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করে।

গাছের জগৎ—তোমার পরিবেশের গাছের জগৎও কম বিচিত্র নয়। বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রকম গাছ দেখা যায়। **তাই সাধারণতঃ সমতলে একরকম, সমুদ্রের ধারে এক রকম আর উঁচু পাহাড়ে থাকে অন্যরকম গাছপালা।** তোমার বাগানেই লক্ষ্য কর। কত রং-বেরংয়ের গাছ। একদিকে রয়েছে শাকসব্জি অন্যদিকে ফুল, ফলের গাছ। কোন কোন গাছ মাটির উপর সোজা দাঁড়িয়ে আছে। আবার কোন গাছের দুর্বল কাণ্ড মাটির উপর লতিয়ে চলেছে। কোন কোন গাছের কাণ্ড বা গুঁড়ি মোটা। তা থেকে বেরিয়েছে শাখা-প্রশাখা। আবার কোন কোন গাছের মাটি থেকেই বেরিয়েছে শাখা-প্রশাখা। কোন কোন গাছের শাখা-প্রশাখা কিছুই নেই, মাথার কাছে আছে শুধু পাতা। এদিকে পরিচিত অধিকাংশ গাছেই দেখেছো ফুল হয়। কিন্তু ফুল হয় না এমন গাছেরও অভাব নেই। এদের মধ্যে কেউ বা সবুজ, কেউ বা সবুজ নয়। কারুর কাণ্ড, পাতা ও মূল কিছুই পৃথক করা যায় না। কারুর কাণ্ড ও পাতা আছে কিন্তু মূল নেই। আবার এমন গাছও আছে যার কাণ্ড, পাতা ও মূল সবই আছে কিন্তু ফুল হয় না। কোন কোন গাছ কয়েকশো বছর বাঁচে। আবার কোন গাছ বাঁচে মাত্র কয়েক মাস। অধিকাংশ গাছই খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। তবে পরমুখাপেক্ষী গাছও আছে। **এমন বৈচিত্র্যময় গাছের জগৎ তোমার পরিবেশ তৈরী করতে সাহায্য করে।**

প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সম্পর্ক

এই জীবজগতে জীবজন্তু ও গাছপালা পরস্পরের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উদ্ভিদই যে আমাদের খাদ্যের উৎস সেকথা আগেই জেনেছো।

আর এও জান উদ্ভিদই বায়ুর অক্সিজেনের সমতা রক্ষা করে চলেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ যাদের চোখে দেখা যায় না তারা ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণীর খাদ্য; সেই এককোষী প্রাণী আবার নানা পোকার খাদ্য; সেই পোকা আবার মাছের খাদ্য; সেই মাছ খায় মানুষ। তেমনি যে পাঁঠা, ভেড়া আমাদের খাদ্য তারাও কিন্তু বেঁচে আছে ওই উদ্ভিদ খেয়ে। শুধু খাদ্য নয় জীবন ধারণের বহু কিছুর জন্যেই আমরা উদ্ভিদের উপর নির্ভর করি। আমাদের পরিধেয় বস্ত্র উদ্ভিদজগৎ থেকেই আসে। প্রাণীর বাসও হয় বৃক্ষের ছায়ায়, বৃক্ষের কোটরে, না হয় গাছের ডালপালা, পাতা দিয়ে তৈরী ঘরে। গাছপালাই আমাদের নানা ওষুধের উৎস। **প্রকৃত-পক্ষে আমাদের সভ্যতা, শিক্ষা সব কিছুর জন্যেই আমরা গাছপালার উপর নির্ভর করি।** তবে এরাও প্রাণি-জগতের উপর নির্ভর করে। এমন গাছও আছে খাদ্যের জন্যে যারা প্রাণীদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। যেমন পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ। অধিকাংশ গাছকে বংশবৃদ্ধির জন্যে প্রাণীর

চিত্র ১০ ঃ গরু পরম তৃপ্ততে কান পেতে আছে

উপর নির্ভর করতে হয়। একে অন্যের উপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকার নাম অন্যোন্যজীবত্ব। অনেক গাছপালা ও প্রাণীর মধ্যে এমন সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। আবার মানুষ যেমন একে অন্যের সাহায্য নেয় প্রাণীও তেমনি অন্যের সাহায্য চায়। তাইতো দেখি পরম তৃপ্ততে কান পেতে আছে গরু আর কাক সেখান থেকে খুঁটে খাচ্ছে পোকাগুলো, যারা জ্বালাতন করছিল গরুটাকে।

সামাজিক পরিবেশ

সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে আমাদের সামাজিক পরিবেশের কথাও জানা প্রয়োজন। সভ্য ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্যে আমাদের অনেক কিছু দরকার হয়। আমাদের দরকারী সব জিনিস কারুর একার পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তাই সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা হিসাবে মানুষকে বিভিন্ন কাজের ভার দিয়ে

চিত্র ১১ ঃ গাঁয়ের হাটে কেনাবেচা আর মেলামেশা চলেছে

বিভিন্ন শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। কৃষক জমি চাষ করে, ফসল উৎপাদন করে। তাঁতী তাঁত বুনে তৈরী করে কাপড়। কুমোর গড়ে হাঁড়ি কলসী, জেলে জাল ফেলে মাছ ধরে। হাটে বা বাজারে আমরা একে অন্যের কাছ থেকে জিনিস কিনি। এইভাবেই দৈনন্দিন জীবনের যা কিছু প্রয়োজন তার জন্যে আমরা পরস্পরের উপর নির্ভর করি। তাই পরস্পরকে বাদ দিয়ে পরিবেশ নয়। এদের সকলকে নিয়েই পরিবেশ, সকলের সঙ্গেই রয়েছে আদান-প্রদানের সম্পর্ক।

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। পরিবেশ কাহাকে বলে? শহরের ও গ্রামের পরিবেশের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য কর কি? পরিবেশের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। "সূর্যই আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস"—ব্যাখ্যা কর।

৩। প্রাকৃতিক ও জৈব পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে তোমাকে প্রভাবিত করে দেখাও।

৪। "পাতা হল গাছের রান্নাঘর"—এই উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য রাখ।

৫। যে জৈব পরিবেশে তুমি বাস কর তাহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লেখ।

৬। সামাজিক পরিবেশ বলিতে কি বোঝায়? ছাত্র হিসাবে তোমার উপর ইহার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখঃ—

(ক) পরিবেশ, (খ) অভিকর্ষ প্রভাব, (গ) জৈব পরিবেশ, (ঘ) সহ-অবস্থান, (ঙ) সামাজিক পরিবেশ।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

৮। প্রতিটি প্রশ্নের পাশে 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখিয়া উত্তর দাওঃ

(ক) শহরে আর গ্রামের প্রকৃতির রূপ কি আলাদা?

(খ) পরিবেশ বলিতে কি কেবল তোমার ঘর-বাড়ীকেই বোঝায়?

(গ) পরিবেশ সৃষ্টিতে বাতাসের চাপের প্রভাবকে অবহেলা করা যায় কি?

(ঘ) খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রাণিজগতে বুদ্ধির খেলা চলে কি?

৯। এককথায় উত্তর দাওঃ

(ক) প্রকৃতিকে কাহার সহিত তুলনা করা যায়?

(খ) খাদ্য প্রস্তুতের জন্য উদ্ভিদকে কোন্ শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়?

(গ) গাছের খাদ্য উৎপাদনের জন্য কোন্ অংশ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে?

(ঘ) মাটির সঙ্গে আমাদের কিসের সম্পর্ক?

১০। শুদ্ধ করিয়া লেখঃ

(ক) জীবজগতের বাসিন্দা আকাশ আর বাতাস।

(খ) গাছপালা, পশুপক্ষী নিয়েই সামাজিক পরিবেশ গড়ে ওঠে।

(গ) মূল গাছের খাদ্য তৈয়ারীর কারখানা।

(ঘ) প্রাকৃতিক উষ্ণতার প্রধান উৎস জল।

(ঙ) গাছের দেহের অতিরিক্ত জল দেহেই জমা থাকে।

১১। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

(ক) মায়ের — সিঁদুরের — মত জেগে — উঠল —। তার — সারা আকাশ জুড়ে — লুকোচুরি। আস্তে আস্তে — করে ঠেলে — —।

(খ) চারপাশের —, বাতাস, — মাটি —, পশুপক্ষী এদের নিয়েই —।

(গ) প্রকৃতি — মত। — যেমন সন্তানকে — করে, আমরাও তেমনি — ফেলে হচ্ছি।

(ঘ) পাতা তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম — দিয়ে — থেকে — টেনে নেয় আর — তৈরী করতে কাজে লাগায়।

(ঙ) প্রাণীদের — চালু রাখতে একটা নির্দিষ্ট — দরকার।

(চ) — সঙ্গে অবিরাম অক্সিজেন টানি আর — সঙ্গে দূষিত — গ্যাস ছেড়ে দিই।

(ছ) জলের — বোধকে — বলি।

(জ) জীবজগতে — ও — পরস্পরের উপর বিশেষভাবে —।

———

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Deptt of Extension Services.
CALCUTTA-27

২. নিজ পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার জীব ও জড়ের সহিত পরিচিতি

[Acquaintance with Various living and non-living forms of their own environment]

পরিবেশ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছে। সেই পরিবেশে আছে একদিকে কত রকমের জীবজন্তু, গাছপালা আর অন্যদিকে ইট, পাথর, কাঠ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি। পরিবেশকে আর যারা সুন্দর করে গড়ে তুলতে সাহায্য করছে তার মধ্যে চাঁদ, তারা ও সূর্যের কথা ভুললে চলবে না। এরাও আমাদের নিত্য সঙ্গী। গল্পে গানে, রূপকথায়ও তাই এদের আনাগোনা।

পরিবেশে যা কিছু আমরা দেখছি তাদেরকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটা জীব, অন্যটা জড়। এই যে তুমি পড়াশুনা করছ, কথা বলছ, খাচ্ছ, স্কুলে যাচ্ছ, দৌড়াচ্ছ এ থেকে কি মনে হয় না একটা ইট বা পাথর বা চেয়ার থেকে তুমি একেবারে আলাদা? বস্তুত তোমার জগৎ একেবারে ভিন্ন। এ জগতের বাসিন্দাদের আনন্দবোধ আছে, কষ্টবোধ আছে। আছে সুখ, দুঃখ, যন্ত্রণা। এদের নিয়েই জীবজগৎ। জীবজগৎ বলতে শুধু তোমাকেই বোঝায় না। তোমার মত আর যাদের প্রাণ আছে তারাও এর আওতায় পড়ে। প্রাণ বলতে কি বোঝায়? সত্যি কথা বলতে কি, এক কথায় প্রাণের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। শত শত বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এই একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন; তবে একটা উদাহরণ দিলে প্রাণ যে কি তা সহজেই বুঝতে পারবে। মনে কর, একটা পাখী ধরে তুমি খাঁচায় পুরে রাখলে। পাখীটি প্রাণপন চেষ্টা করে চলেছে পালিয়ে যাবার জন্যে। তুমি কিন্তু তাকে এখনই ছেড়ে দিতে চাও না। এরই মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে তুমি কোন কাজে খুব ব্যস্ত থাকায় ঐ সুন্দর পাখীটার কথা একেবারেই ভুলে গেছ। তার খাওয়া হয়নি, সামান্য জলটুকুও না পেয়ে সে ছট্‌ফট্‌ করছে। পাখীটির কথা হঠাৎ মনে হতেই তুমি তার কাছে ছুটে গেলে। গিয়ে দেখলে পাখীটি মরে গেছে। আচ্ছা এবার বলত পাখীটিকে মরা বলছ কেন? এর

কি কোন পরিবর্তন ঘটেছে? হ্যাঁ পরিবর্তন নিশ্চয় ঘটেছে। আর সেটা হচ্ছে যে পাখীটির দেহে আর প্রাণ নাই। অর্থাৎ এর মানে হলো ঐ পাখীটির দেহে লক্ষ্য করবার মত পরিবর্তন ঘটেছে। ও যে ক্ষিধের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করছিল, ওর যে ঘুরে বেড়াবার ক্ষমতা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি যদি আলপিন দিয়ে ওর গায়ে খোঁচা মার তা হলেও সে নড়বে না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে পাখীটির আগের মত নড়াচড়া বা অন্যান্য কাজ করার ক্ষমতা নাই। ঐ ক্ষমতা দেহের এক রকম জীবন্ত পদার্থের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

বিজ্ঞানীরা জীবন্ত পদার্থটির নাম দিয়েছেন প্রোটোপ্লাজম। প্রোটোপ্লাজম সত্যিই এক রহস্যময় পদার্থ। যতক্ষণ এর কাজ করার ক্ষমতা থাকে ততক্ষণই এ জীবন্ত। অন্যথায় এ জড়। জীবের দেহে সর্বদাই এই পদার্থটি জীবন্ত রয়েছে। জড়ের দেহে এ পদার্থটি থাকে না। আর থাকলেও জীবন্ত নয়। সেজন্যে জীব যে সব কাজ করতে পারে, জড় তা পারে না। এ থেকে বোঝা যায় প্রোটোপ্লাজমের মধ্য দিয়েই প্রাণের লক্ষণ ফুটে ওঠে। **মনে রাখতে হবে জীবও মৃত্যুর পরে জড়ে পরিণত হয়।**

তোমার বাগানে তুমি বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যে গাছগুলোকে ক্রমশঃ বড় হতে দেখলে, যাতে একদিন ফুল দেখা গেল, তা থেকে ফল হলো, সেই গাছটাই তোমার চোখের সামনে একদিন মরে গেল। সে জড়ে পরিণত হলো। গাছপালা, পশুপাখী সবার বেলায় এই একই নিয়ম। এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই! কবির কথাই সত্যি—

"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?"

এখন বলা যায়, যাদের প্রাণ আছে তারা জীব, তাছাড়া সব কিছুই জড়। পশুপাখী, গাছপালা এদেরও প্রাণ আছে। তাই এরাও তোমার মত জীবজগতের অংশ।

তোমার পরিবেশে কত রকমের জীব ও জড় পদার্থ দেখতে পাও। তাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচিত হলে বুঝতে পারবে যে **জীবের সঙ্গে জড়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।** মাটি, জল, বাতাস জীবের বাঁচার জন্যে রসদ যোগায়। মৃত্যুর পর জীবের দেহ ঐ মাটি জল বাতাসেই মিশে যায়। তাই বলা যায় প্রকৃতিতে কোন কিছুই হারায় না। প্রাণের স্পন্দন বজায় রাখতে জীব পার্থিব পরিবেশ থেকে যে সব মৌল উপাদান সংগ্রহ করে তার প্রতিটি

চিত্র ১২ ঃ জীব ও জড়ের পার্থক্য

অণুই সে পরিবেশে জীবিত থাকাকালে বা মৃত্যুর পর ফিরিয়ে দেয়। কোন কিছুর স্থায়ী সংরক্ষণ তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেজন্যেই আদি অনন্তকাল

চিত্র ১৩ : জীব ও জড়ের পার্থক্য

ধরে একই পদার্থের সীমিত অণু ব্যবহৃত হলেও তার ঘাটতি পড়ে না। এখন জীব-জড়ের মধ্যে কি কি লক্ষণ দেখে ওদের চিনতে পারবে জেনে রাখ।

জীব	জড়
১। জীবের প্রাণ আছে।	১। জড়ের প্রাণ নাই।
২। প্রত্যেক জীবের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে। যেমন, মটর গাছ, আম গাছ, কুকুর, গরু ইত্যাদি।	২। জড়ের নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন নাই। তবে প্রয়োজন অনুসারে ইহার আকার বা আয়তন পরিবর্তন করা যায়।
৩। পুষ্টির জন্যে জীব খাবার খায়। ফলে দেহ যে বাড়ছে তা বেশ বোঝা যায়।	৩। জড়ের খাবারের দরকার হয় না। জীবের মত প্রকৃত বৃদ্ধি নাই। তবে দেহের বাইরে কোন পদার্থ জমে বৃদ্ধি ঘটতে পারে।
৪। জীব মাত্রেই শ্বসন চালায়। কেননা এ-থেকেই কাজ করার শক্তি আসে। এ কাজটি বন্ধ হলেই পশু-পাখী, গাছপালা সবারই মৃত্যু ঘটে।	৪। জড়ের শ্বসনের প্রয়োজন নাই।
৫। এরা ইচ্ছা করলেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে বা দরকার মত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করতে পারে।	৫। জড় অনড়; কেউ না ঠেলা দিলে আগে যেখানে ছিল দিনের পর দিন সেখানেই থাকে।
৬। উত্তেজিত হলে জীব সাড়া দেয়। অর্থাৎ তা প্রকাশ করে।	৬। উত্তেজিত করলে সাড়া দেবার ক্ষমতা জড়ের নাই।
৭। জীব পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।	৭। পরিবেশের বশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা জড়ের নাই।
৮। এরা বংশ বিস্তার করে।	৮। এরা তা পারে না।
৯। জীব মাত্রেই জন্মায়, ক্রমশ বড় হয় আর একদিন মারাও যায়, অর্থাৎ এদের বেঁচে থাকার মোটামুটি একটা সময় আছে।	৯। এদের বাঁধা ধরা সময় নাই। কেননা এদের যেমন জন্ম নাই তেমনি মৃত্যুও নাই।

কি কি লক্ষণ দেখে জীবকে জড় থেকে আলাদা করতে পার তা তো শিখলে। এখন এস নানারকম জীবের সঙ্গে পরিচিত হই।

সরু-সুতোর মত লোম দিয়েই এরা মূলের কাজ চালায়। তবে এদের কাণ্ড আর পাতা দুই-ই থাকলেও অনেকের এ দুটো নাই। মস বহুরকমের হয়।

এদের চেয়ে আর একটু উন্নত গাছ যারা, তারা কিন্তু তোমার খুব চেনা আর খুব প্রিয়। ফার্ন-এর কথা বলছি। এদের দেহকে কাণ্ড, পাতা ও মূলে ভাগ করা যায়। ভাঙ্গা দেওয়ালের ভিতর দিকে তাকিয়ে দেখ সেখানে এই বাহারে গাছগুলোকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছো? এদের **পাতাগুলি কচি** বেলায় কেমন কুকুরের লেজের মত গুটিয়ে রয়েছে। গায়ে আর পাতার গোড়ায় দেখ ভেলভেটের মত বাদামী রংয়ের রোঁয়া। ফার্নও নানা জাতের হয়। এদের যত বাহার ঐ পাতাতে। কোন পাতা লম্বা আম পাতার মত, কোন পাতা খেজুর পাতার মত কাটা কাটা। পাতার নিচেটা লক্ষ্য কর, দেখ কেন গোলমাল গুটি সাজানো রয়েছে।

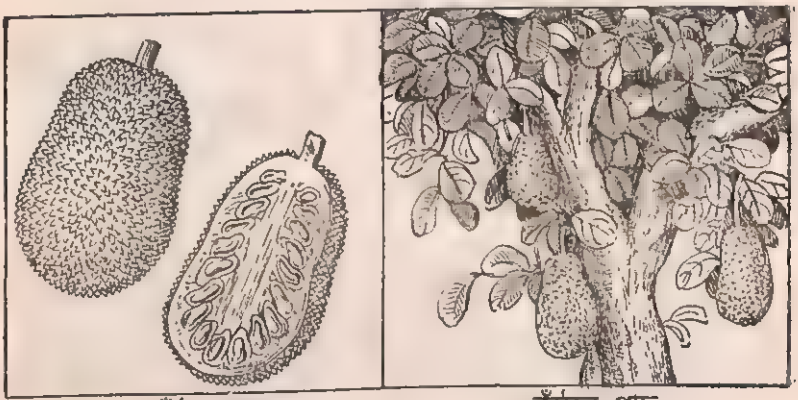

কাঁঠাল কাঁঠাল গাছ

চিত্র ১৬

এতক্ষণ যে গাছগুলোর সঙ্গে পরিচিত হলে এদের কোন ফুল হয় না। সেজন্যে এ গাছগুলোকে অপুষ্পক গাছ বলে। এদের এক ধরনের রেণু থেকে বা দেহের কোন অংশ থেকেই নতুন করে গাছ জন্মায়। এবার যাদের কথা বলব তারা সবাই ফুলে, ফলে ভরে থাকে বছরের নানা সময়ে। তোমার বাগানে কত রকমের ফুল গাছ দেখেছো। গাঁদা, বেল, টগর, দোপাটী, জবা, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ আরও কত কি। এছাড়া আছে নানান শাক-সবজি আর ফলের গাছ। মটর, শুশ্‌নি, কলমী, লাউ, কুমড়ো, কলা, আলু, বেগুন,

এদের মত অনেকের দেহ নিংড়েই আজকাল কত রকমের ওষুধ তৈরী হচ্ছে। এথেকে তোমরা ভেবে নিও না যে সব ব্যাঙের ছাতাই আমাদের উপকারে আসে। এমন অনেক আছে যারা আমাদের ফসলের নানান রোগ ঘটায়। কত বিজ্ঞানীই যে এদের আয়ত্তে আনার জন্যে গবেষণা করে চলেছেন তার ইয়ত্তা নাই। দেখতো বিজ্ঞানীরা আমাদের কত উপকার করছেন। বড় হয়ে এঁদের মত তুমিও তো বিজ্ঞানী হতে পারো?

আচ্ছা, এবার চল ভিজে দেওয়াল আর ছায়াঘেরা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাগুলো ঘুরে আসা যাক। কী দেখছ? কেমন ভেড়ার লোমের মত নরম সবুজ ছোট

চিত্র ১৫ ঃ উপরে মস; নিচে ফার্ন

ছোট গাছগুলো দেওয়ালটা ছেয়ে ফেলেছে। লক্ষ্য কর, এদের অনেকের মাথায় আবার পুরোনো আমলের ইংরেজ সৈন্যের টুপির মত টুপি রয়েছে। এরা আর এদের মত গাছগুলোকে বলে **মস**। লক্ষ্য কর এদের দেহে মূল নাই।

গাছপালার সঙ্গে পরিচয়

গাছপালা আর পশুপাখী নিয়েই যে জীবজগৎ একথা তোমরা জান। গাছপালাই বল আর পশুপাখীই বল সবাইকে কি একই রকম হতে দেখেছ? না, তারা এক রকম তো নয়ই উপরন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য বৈচিত্র্য।

চিত্র ১৪ : শেওলা (বাম দিকে); ছত্রাক (ডান দিকে)

পৃথিবী সেজন্যেই তো এত সুন্দর। যা কিছু সব এক রকম হলে কি কখনও ভাল লাগত?

তোমার পরিচিত অনেক গাছপালাই রয়েছে। এরা দেখতে নিশ্চয় নানা রকমের। এদের অধিকাংশের দেহের রংই সবুজ। মধ্যে মধ্যে অবশ্য হলদে, বেগুনি, লালের ছোঁয়া দেখতে পাও।

সবুজ রংয়ের গাছপালা, বলতে সবারই কিন্তু কান্ড, ডালপালা, পাতা, মূল নাই। সবেচেয়ে যারা সরল আলাদা আলাদাভাবে তাদের এসব কিছুই থাকে না। কলকাতায় যেখানে অনবরত জল পড়ে সেখানে তোমার পা কি কোনদিন পিছলে যায়নি? লক্ষ্য করলে দেখবে ওখানে সরু সরু সুতোর মত এক ধরনের **শেওলা রয়েছে।** এত ক্ষুদ্র হলে কি হবে এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী করে নেয়। পাতার মত চ্যাপ্টা, গোল নানা ধরনের শেওয়া হয়। এদের সম্বন্ধে বড় হয়ে বিশদভাবে জানতে পারবে।

শেওলার মত আর এক ধরনের উদ্ভিদ আছে। এদের দেহও কান্ড, পাতা ও মূলে বিভক্ত নয়। তবে এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরা শেওলার মত নিজেদের **খাবার তৈরী করে নিতে পারে না; কেননা এদের দেহে ক্লোরোফিল নাই।** খাদ্য তৈরী করতে পারে না বলেই এরা সারগাদা, পচা কাঠ, ভেজা জুতো-জামা, পচা ফল, এমনকি মরা পচা জন্তু-জানোয়ারের উপরেও জন্মায়। এদের যদি ব্যাঙের ছাতা বলি তাহলে তোমরা সহজেই চিনতে পারবে। বিজ্ঞানী অবশ্য এদের নাম দিয়েছেন ছত্রাক। কত রকমের ব্যাঙের ছাতা দেখেছো? সাদা ব্যাঙের ছাতা তো প্রচুর দেখা যায়। এদের ব্যাঙের ছাতা বললেও বৃষ্টিতে বা রোদে ব্যাঙের মাথায় ছাতা ধরে এরা কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না। এরা এক ধরনের গাছ। অধিকাংশ গাছের মত এরাও এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। একটু লক্ষ্য করলে ঝিরঝিরে বর্ষায় দেখবে ঘাসের বনে বা আবর্জনার পাহাড় ফুঁড়ে এরা কেমন মাথা জাগাচ্ছে। আজকাল ব্যাঙের ছাতার চাষ করার উদ্যোগ চলছে। এক ধরনের ব্যাঙের ছাতা খুব মুখরোচক খাদ্য। হলদে, মেটে, নানান রকমের ব্যাঙের ছাতা দেখতে পাবে। এদের দেহটা দেখ কত নরম। বেশীদিন এরা বেঁচেও থাকে না। এদের কেউ কেউ তারার মত দেখতে, কেউ বলের মত, কেউ আবার জালের ঘোমটা পরে থাকে। দেখতে এরা কত যে সুন্দর হয় না দেখলে বুঝবে না। **তোমাদের শিক্ষক মশাইকে নিয়ে বর্ষার একটা মেঘলাদিনে তোমার বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কতকগুলো জায়গায় ঘুরে এস না কেন!** দেখবে আর জানবে, এরা দেখতে ছোট হলে কি হবে এদের রূপের বাহার দাঁড়িয়ে দেখার মত। এ সবতো মাটির উপরেই দেখলে। এবার একবার গাছের গুঁড়ির দিকগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে চল তো। দেখবে ওখানে থাকে থাকে সাজান কতকগুলো তাকের মত জিনিস রয়েছে। এদের উপরটা লাল জুতোর রংয়ের, নিচেটা ঘিয়ে রংয়ের। এরাও ছত্রাক। এ ছাড়া কত রকমের যে ছত্রাক আছে তার ইয়ত্তা নাই। পেনিসিলিন ওষুধ খাওনি এমন বোধ হয় কেউই নাই। এই ওষুধ কি থেকে হয় জান? পেনিসিলিয়াম নামে এক ধরনের ছত্রাক থেকে।

লঙ্কা, মূলো, কপি, পেঁপে, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, তাল, নারিকেল কত রকমের অগুন্তি গাছই না রয়েছে আমাদের চারদিকে। এদের অনেককেই আমরা চিনি। তোমরা যদি কেউ এখনও কোন কোনটা না চিনে থাক তবে ইতিমধ্যে এদের চিনে ফেল। এদের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে ভাল করে চোখ মেলে যত্ন করে দেখতে হবে এদের কান্ড কেমন; পাতার চেহারাই বা কি; কখন ফুল ফোটে, ফলটাই বা কেমন হয়। এই সব **লক্ষণগুলো দেখে নিজের একটা খাতায় টুকে রাখ। মাঝে মাঝে শিক্ষক মশাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে এদের সঙ্গে পরিচিত হতে। তিনি এ ব্যাপারে তোমায় খুব সাহায্য করবেন।**

আচ্ছা যে গাছগুলোর নাম করা হল এদের কান্ডের ধরন কি সবারই এক রকম? দেখতো লাউকুমড়ো কেমন অবলম্বনকে জড়িয়ে ধরে উপরে ওঠে। কলমী, শুশুনী কেমন জলের ধারে লতিয়ে যায়। আর অন্যগুলো কেমন

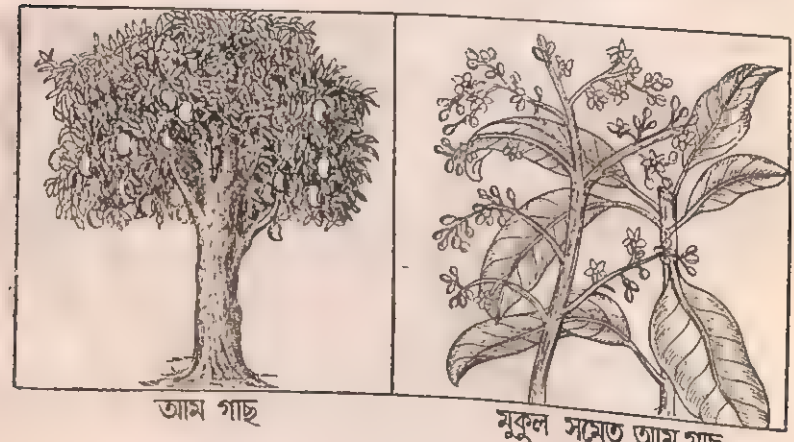

আম গাছ মুকুল সমেত আম গাছ

চিত্র ১৭

ডাঙ্গায় খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। মূলো, কপি, আলু এদের কান্ড নরম। লঙ্কা, বেগুনের কান্ড বেশ শক্ত, তবে এরা ঝোপের মত হয়। আম, জাম, কাঁঠালের তো প্রকান্ড একটা কান্ডই রয়েছে। এছাড়া মাটির উপরে ঘাসের আস্তরণ রয়েছে দেখ। এই ঘাস, ধান, যব, ভুট্টা, আখ এমনকি বাঁশ গাছও এক বিশেষ গোষ্ঠীর গাছ। এদের লম্বা লম্বা পাব থাকে। পাতাগুলোও বিশেষ ধরনের। মরুভূমিতে খেজুর, পান্থপাদপ, ক্যাকটাস জাতীয় গাছই

জন্মায়। জলের গাছপালাই বা কোন অংশে কম যায়! শালুক, পদ্ম পুকুরের পাঁকের মধ্যে জন্মায়। ফুলগুলো জলের উপরে ভাসে। এরা ছাড়া আরো অনেক গাছপালা জলে জন্মায়। জলের মধ্যে একেবারে ডুবে থাকা পাতাঝাঁঝির নাম শুনেছ কী? এ গাছগুলো থলি তৈরী করে জলের ছোটছোট পোকা-মাকড় ধরে, আর খায়। এদের সম্বন্ধে বড় হয়ে অনেক কিছু জানবে।

এতক্ষণ যাদের সম্বন্ধে বলা হল তারা সমতলের বাসিন্দা। **আমাদের দেশে পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র সবই আছে। পাহাড়, সমতল আর সমুদ্রের আবহাওয়ার তারতম্য আছে।** সেজন্যে পাহাড়ে, পর্বতে বিশেষ ধরনের গাছপালা জন্মায়। সাগরের জলেও জন্মায় বিশেষ জাতের গাছপালা। পাহাড়ে গেলে দেখবে পাইন, ভূর্জপত্র, রোডোডেনড্রন, লতানো গুল্ম আর

পেঁপে সমেত পেঁপে গাছ
চিত্র ১৯

মুকুল সমেত পেঁপে গাছ
চিত্র ১৮

রংচংয়ে নানা ফুলের মেলা। এরা সবাই শীত পছন্দ করে। দার্জিলিংয়ের আর সিলেটের কমলালেবু তো তোমরা অনেকেই খেয়েছো। দার্জিলিংয়ের চা গাছ পৃথিবী বিখ্যাত। এদিকে সমুদ্রের ধারের জায়গাগুলোতে নারিকেল, সুপারি, গোলপাতা, হোগলা, গরান, সুন্দরী এইসব গাছই বেশী দেখা যায়। তবেই দেখ কত রকমের গাছপালা রয়েছে আমাদের চারদিকে। এদের সম্বন্ধে বড় হলে আরো ভালোভাবে জানতে পারবে।

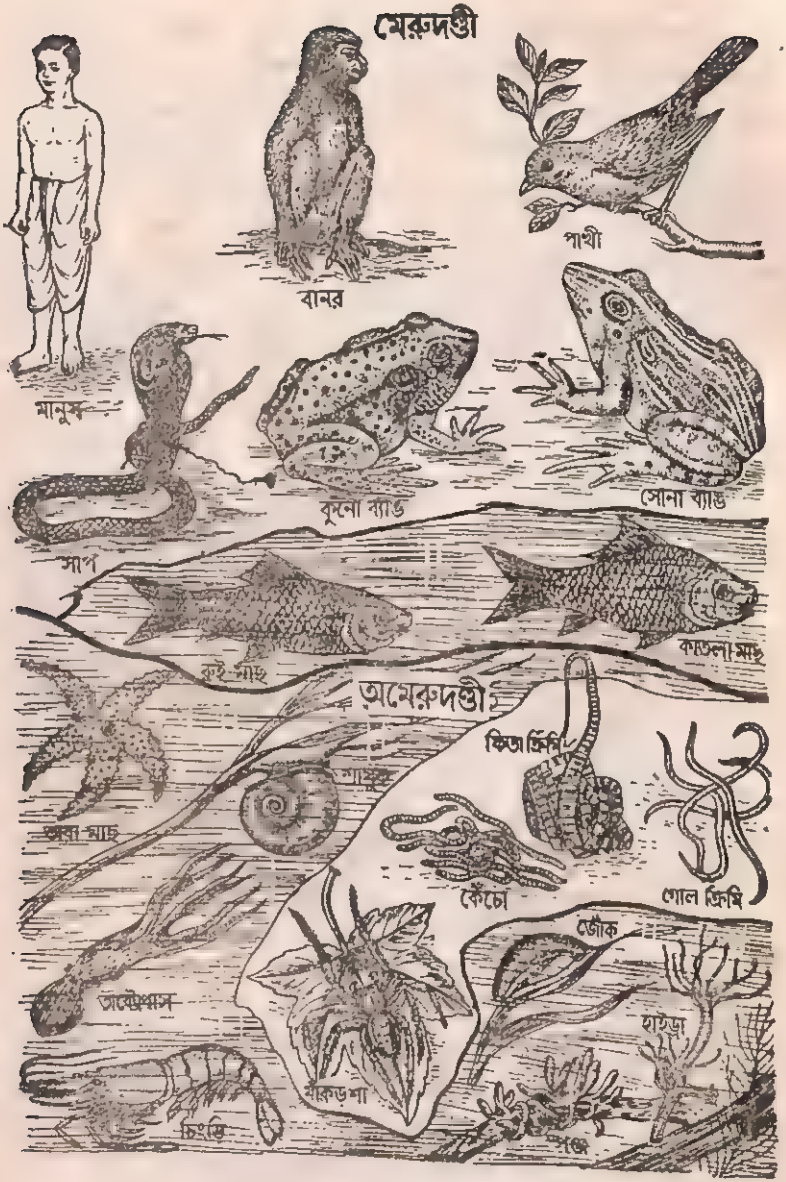

চিত্র ২০ ঃ বিভিন্ন প্রকার মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী

পশুপাখীর সঙ্গে পরিচয়ঃ গাছপালার মত **পশুপাখীরাই** কি কম বৈচিত্র্যময়! এদের আকার, আয়তন, রং-এর বাহার দেখবার মত। অ্যামিবার মত এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের খালি চোখে দেখাই যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। আমরা অবশ্য সচরাচর খালি চোখে দেখা যায় এমন প্রাণীর সঙ্গেই আগে পরিচিত হই। পুকুরে ডুবে থাকা শুকনো ডালপালাগুলো একবার ভাল করে লক্ষ্য কর তো। এদের কোন কোনটায় দেখবে ভালপালাগুলোকে ঘিরে ফুটো ফুটো এক বিশেষ ধরনের আবরণ আছে। এগুলো এক ধরনের প্রাণী। এদের আমরা বলি স্পঞ্জ। সমুদ্রেই নানা রকমের স্পঞ্জের দেখা মেলে। মলের ভিতরে কিলবিল করে যে দুমুখ সরু সাদা কেঁচোর মত প্রাণী তাদের তো তোমরা দেখেছো। এগুলোকে বলে **গোলকৃমি।** এইরকম আর এক ধরনের কৃমি আছে যাদের দেহ চ্যাপ্টা, বা ফিতের মত। এদের বলে ফিতাকৃমি।

কেঁচো দেখনি তোমাদের মধ্যে এমন বোধ হয় কেউই নাই। বাগানে, মাঠে সর্বত্র এদের দেখা যায়। এরা এক সঙ্গে হাজারে হাজারে বাস করে। পাকানো পাকানো মাটির কুণ্ডলী দেখলেই সেগুলোকে কেঁচোর মল বলে চিনতে হবে। কেঁচো যে জমিতে বাস করে তা অত্যন্ত উর্বর হয়। কেননা এরা জমি চষার কাজ তো করেই, সঙ্গে সঙ্গে ওদের তৈরী গর্ত দিয়ে বাতাস, জল, রোদ, মাটির অনেক ভেতরে পৌঁছায়। সেজন্যে **কেঁচোকে চাষীর বন্ধু বলা হয়।**

তোমরা বাড়ীতে বা বাড়ীর আশপাশে **আরশোলা, মাকড়সা, মৌমাছি, প্রজাপতি, মাছি** প্রভৃতি কত রকমের পোকা দেখেছো। এদের কতকগুলো আমাদের জ্বালাতন করে। তবে প্রজাপতি, মথ, মৌমাছি আমাদের উপকার করে। এরা ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়িয়ে ফুল থেকে ফল হতে সাহায্য করে। মৌমাছি আবার আমাদের অতি প্রিয় মধু তৈরী করে। **প্রজাপতির মত সৌন্দর্য ডানায়।** নানা রংয়ের আর নানান নকশার প্রজাপতি দেখলে তাদের দিক থেকে চোখ ফেরান যায় না। প্রজাপতি সংগ্রহ করার নেশা অনেকের আছে। বড় হয়ে প্রজাপতি ধরার কায়দাকানুন জানতে পারবে। প্রজাপতি থেকে আরম্ভ করে গোবর পোকা, ফড়িং, উইঁচিমড়ে, শ্যামা পোকা, গঙ্গা ফড়িং সবারই পা আছে। এ দেখেই আর এদের ডানা দেখে চেনা যায়। **চিংড়ি মাছ কিন্তু মাছ নয়—এক ধরনের সন্ধিপদ প্রাণী।**

এবার দেখ পুকুর ধারে বা ঘাস বনে ধীর গতিতে চলেছে **শামুক, ঝিনুক, গুগলী।** এরা সবাই এক জাতের। এদের খোলটা কেমন সুন্দর পেঁচান আর

শক্ত দেখ। চওড়া মাংসপিণ্ড দিয়ে মাটি আঁকড়ে এরা চলাফেরা করে। গুগ্‌লীর, শামুকের চলা তোমরা অনেকেই দেখেছো। আচ্ছা, তোমরা তারামাছের নাম শুনেছো? এদের সমুদ্রেই পাওয়া যায়। বেশ সুন্দর দেখতে এরা—ঠিক তারার মত। ছবিতে তারামাছ দেখে নাও (চিত্র ২০)। এতক্ষণে যাদের সঙ্গে পরিচিত হলে তাদের কিন্তু মেরুদণ্ড নাই। মাছ, ব্যাং, সাপ, পাখী, বাঘ, সিংহ, কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, মানুষ প্রভৃতি প্রত্যেকেরই মেরুদণ্ড আছে। এরা তাই ওদের থেকে একেবারে আলাদা। কত রকমের

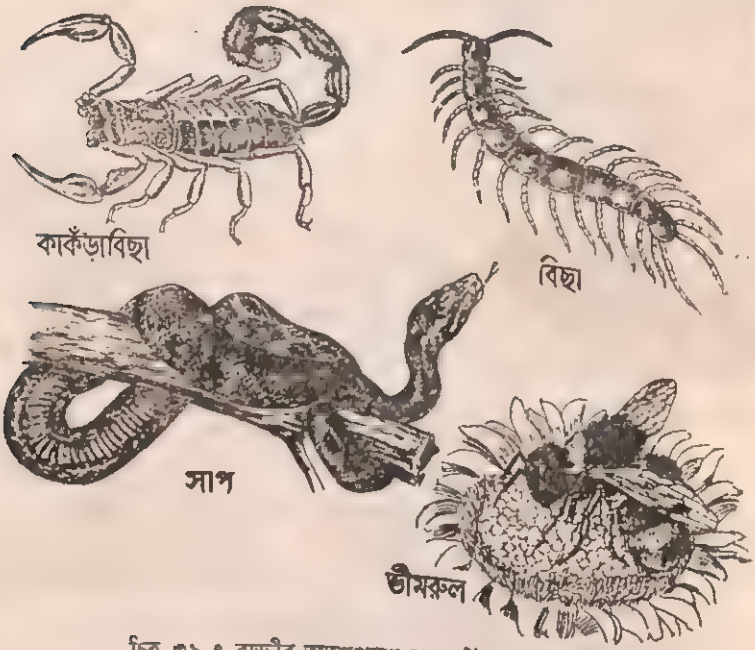

চিত্র ৩১ ঃ বাড়ীর আশেপাশে কয়েকটি ভয়াবহ প্রাণী

মাছই তোমরা দেখেছো। রুই, কাতলা, মৃগেল, বোয়াল টেংরা, কই, মাগুর, শিঙ্গি, তপসে, ইলিশ, ভেটকি ইত্যাদি। এদের সবার চেহারায় এমন সব বৈশিষ্ট্য আছে যা দেখলে এদের ঠিক চেনা যায়। তোমরা মাছগুলো বাজারে ঘুরে ঘুরে চিনতে শেখ। মাছের দেহ মাকুর মত। এদের অনেকের দেহেই আঁশ আছে, আছে ফুলকা, পটকা আর পাখনা। পুকুরের মাছ আর সমুদ্রের মাছের চেহারা অনেক সময় আলাদা হয়। মাছ জলে বাস করে। কই মাছ

অবশ্য তাল গাছে উঠেও বেঁচে থাকে শোনা যায়। এদিকে ব্যাঙ এমন জীব যে এরা জলে আর ডাঙায় সমানভাবে বাঁচতে পারে। এজন্যে এদের বলে উভচর। সোনা ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ তোমরা দেখেছো। মুখ সরু, তেল-চকচকে

চিত্র ২২ : বিভিন্ন প্রকার বন্য প্রাণী

গা, সবুজ রংয়ের ব্যাঙই সোনা ব্যাঙ। ধোঁয়াটে আর খসখসে চামড়াবিশিষ্ট ব্যাঙ কুনো ব্যাঙ। ব্যাঙের মাংস সহজে হজম হয়। এর মাংস বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে। ব্যাঙের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সাপের। সাপ ডাঙ্গাতেই বাস করে

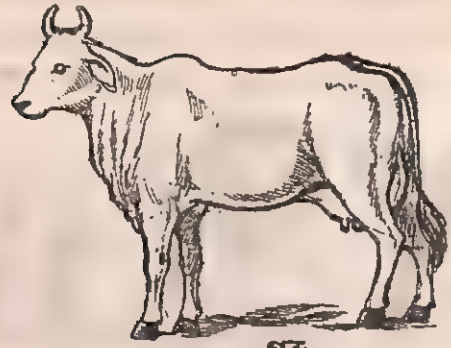
গরু

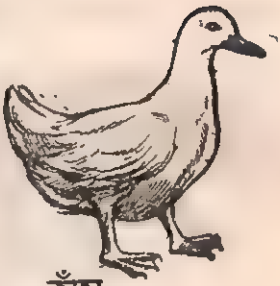
হাঁস

বিড়াল

খরগোস

পাখি

মোরগ

চিত্র ২৩ ঃ বিভিন্ন প্রকার পোষা পশু-পাখী

বেশী। ঢোঁড়া সাপ জলে বাস করে। সাপ নানান জাতের। কেউটে, বোরা, শাঁখামুটি, গোখরো, লাউডগা, ঢ্যামনা, হেলে প্রভৃতি। এদের অনেকের জোরালো

বিষ আছে। আবার কারো কারো বিষ নাই। ঈগল পাখী সাপ খায় জান? পাখীরা কিন্তু রংয়ের আর চেহারার বাহারে অনুপম। কাকাতুয়ার ঝুঁটি, টিয়ার রং আর ঠোঁট, ময়ূরের পেখম, বকের সাদা ধবধবে রং, নীলকণ্ঠের নীল রং দেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকোনি এমনি কি কেউ আছে? ডানা আর লেজ পাখীকে আকাশে ভেসে বেড়াতে সাহায্য করে। পাখীদের মধ্যে কাজে কর্মে, আকারে, চরিত্রে কত যে বৈচিত্র্য তা না দেখলে বোঝা যায় না। চিড়িয়াখানায় যদি আস তো দেখবে পাখীর রাজ্যে কত সুন্দর সুন্দর পাখীই না আছে। ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া, মানুষের কথাকে হুবহু নকল করে ফেলে! ওদের মুখে নকল ডাক কি কখনো শুনেছো? এইসব পাখী পুষতে মানুষ খুব ভালবাসে।

মানুষ প্রাণিজগতের সবচেয়ে সেরা আর উন্নত জীব। এরা মায়ের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে। এজন্যে এদের বলে স্তন্যপায়ী। আবার এরা সরাসরি বাচ্চা দেয়। ইঁদুর, খরগোস, বিড়াল, কুকুর, গরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা, বাঘ, সিংহ, তিমি, বাদুড় ইত্যাদিকে একই তালিকায় ফেলা যায়।

এতক্ষণ জীবজগতের সঙ্গে পরিচিত হলে। এবার তুমি একটি সুন্দর পুষ্প পদ্ম, আম, জাতীয় পাখী ও জাতীয় পশুর সঙ্গে পরিচিত হও।

(ক) পদ্ম

পদ্মের চোখ ঝলসান রূপ। সেইজন্যেই তো যা কিছু সুন্দর তাকেই পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সুন্দর চোখকে বলে পদ্ম আঁখি। সুন্দর মেয়েকে বলে পদ্মিনী। আর অতুলনীয় অবদানের জন্যে পরানো হয় পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ প্রভৃতির মুকুট। রামায়ণ থেকে জানা যায় রামচন্দ্র ১০৮টি পদ্ম দিয়েই দুর্গাকে তুষ্ট করে অসময়ে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন। যে পুকুরে বা জলাশয়ে পদ্ম ফোটে সেখানটা সে আলো করে থাকে। পদ্ম ফুল আমাদের খুবই প্রিয়। দুর্গা পুজোয় এই পদ্ম না হলেই চলে না। সবচেয়ে সুন্দর ফুল বলেই তো মায়ের পায়ে নিবেদন না করলে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সত্যি জাতীয় পুষ্পের মর্যাদা পাবার একমাত্র যোগ্য পদ্ম।*

*অবশ্য পদ্মকে জাতীয় পুষ্পের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারটা এখনও বিবেচনাধীন আছে।

বাংলার সর্বত্র এই ফুল দেখা যায়। বৎসরের মধ্যেই পদ্মের জীবন চক্র শেষ হয়। পদ্ম বিরুৎ জাতীয় গাছ। অগভীর জলের পাঁক মাটির মধ্যে দিয়ে পদ্ম তার ফাঁপা কাণ্ডকে এমনভাবে চালিয়ে দেয় যাতে করে আবার

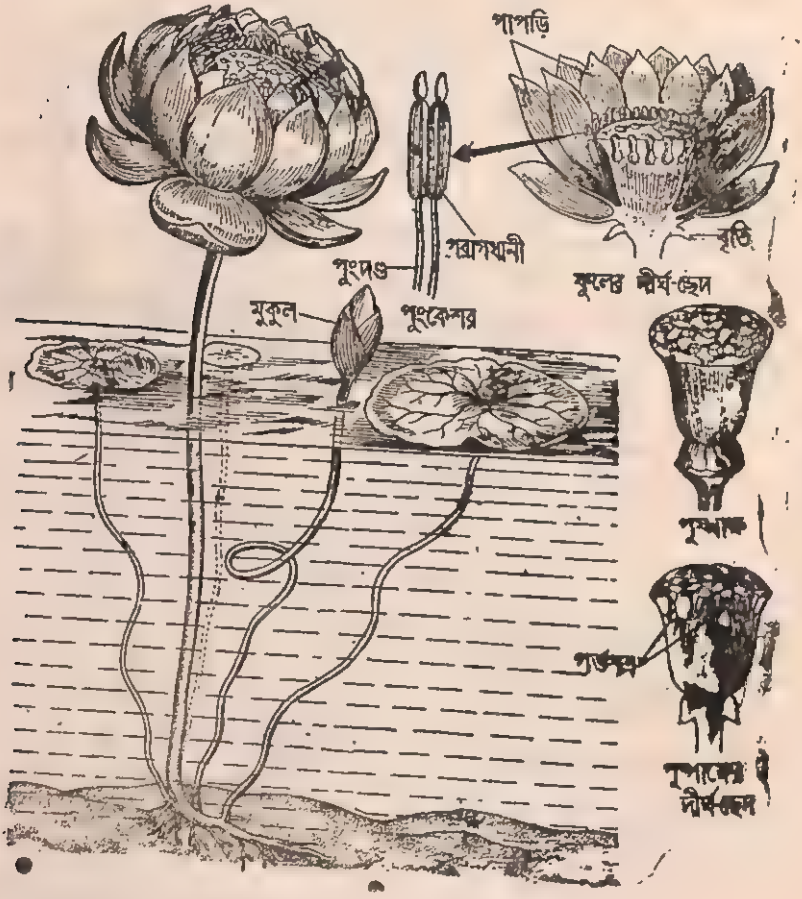

চিত্র ২৪ : পদ্ম ফুলের গাছ ও তার বিভিন্ন অংশ

কিছুটা দূরে নতুন গাছ হিসাবে বাড়তে পারে। সেখানে নতুন করে মূল জন্মায়, পাতা বেরোয়।

পদ্মপাতা সরল। পাতার উপরটা এতই মসৃণ যে জলের ফোঁটা পড়লে

তা অনেকক্ষণ টলটল করতে থাকে। এর আকার গোল। বোঁটা লম্বা, গোল আর ফাঁপা। পাতার মাঝখানটিতে বোঁটা লেগে থাকে। পাতা সব সময় জলের উপরে ভাসতে থাকে। পাতার রং সবুজ এবং আকারে এত বড় যে কোন কোন জায়গায় এতে ভাত খাওয়া হয়।

বড় বড় বোঁটায় একটি করে ফুল ফোটে। ফুলের বোঁটায় ছোট ছোট কাঁটা থাকে। ফুলের রংয়ের বাহার তুলনাহীন। ফুলের একেবারে বাইরের স্তবকটি এক থেকে চারটি অংশ (বৃত্যাংশ) নিয়ে তৈরী। এদের একত্রে বলে **বৃতি**। ওই অংশগুলো আলাদা আলাদা বা গোড়ার দিকে জোড়া থাকে বৃতির ভেতরে থাকে অসংখ্য উজ্জ্বল গোলাপী বা সাদা রংয়ের পাপড়ি। পাপড়ি ভারি মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। সূর্যের আলো ফোটার সাথে সাথে এরা ছড়িয়ে যায়; আবার আলো কমে এলে গুটিয়ে যায়। এদের একত্রে বলে **দলমণ্ডল**। পাপড়িগুলি ক্রমশঃ ভেতরের দিকে ছোট হয়ে যায়। **দলমণ্ডলের** ভেতরে থাকে **পুংকেশর**। পুংকেশর সখ্যায় অনেক। এর থেকে তৈরী হয় পরাগ বা রেণু। রেণুর রং হলদে আর দেখতে ধুলোর কণার মত। ফুলের একেবারে মাঝখানে থাকে গর্ভাশয়। গর্ভাশয় অনেকগুলো গর্ভপত্র নিয়ে তৈরী। গর্ভপত্রগুলি স্পঞ্জের মত ফোলা। বিশেষ আকারে পুষ্পাক্ষের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে সাজান থাকে। পুষ্পাক্ষটি খুব হালকা। এতে প্রচুর বাতাস থাকে; এজন্যে এর পক্ষে জলে ভেসে থাকা খুব সহজ হয়। ফল গুচ্ছিত। পদ্মের বীজ ও অন্যান্য অংশ ওষুধ হিসাবে ব্যবহার হয়।

(খ) আম

আম আমাদের প্রত্যেকের অতি পরিচিত প্রিয় ফল। মিষ্টি আমের স্বাদ ভোলবার নয়। আমাদের দেশে যত জমিতে ফলের চাষ হয় তার প্রায় অর্ধেক অংশেই আম চাষ হয়। মালদহে আমের প্রচুর চাষ হয়। আম চাষের জন্যে নির্দিষ্ট কোন জমির দরকার নাই। নানা রকমের মাটিতেই আম হয়। আম গাছ বেশ লম্বা। এর আয়ুও অনেক বছর। ডালপালা ছড়িয়ে অনেকটা জায়গা ছেয়ে ফেলে এরা। আম গাছের একটা মোটা গুঁড়ি থাকে। তার উপরে থাকে বহু ডালপালা।

আম গাছের পাতা লম্বাটে আর সবুজ। এগুলি এক একটি করে কিছুটা

দূরে দূরে সাজান থাকে। সারাবছর ধরে আমগাছ ঘন পাতায় ছাওয়া থাকে। পাতার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটা শক্ত শিরা। এই শিরার দুপাশ থেকে বেরিয়ে জালের মত ছড়িয়ে থাকে বহু শিরা আর উপশিরা। পাতার বৃন্তটি বেশ শক্ত। বৃন্তের গোড়াটি ফোলা আর পাতার আগাটি সুচাল।

আমের ফুল একসঙ্গে অনেক জন্মায়। গাছের আগায় বা পাতার কক্ষ থেকে ফুলের মঞ্জরী বেরোয়। ফুলগুলির মিষ্টি গন্ধ হলে কি হবে আকৃতিতে এরা খুব ছোট। ফুল ফুটলে মিষ্টি গন্ধের টানে মৌমাছি ও নানান কীট-পতগ ফুলের কাছে গুণ গুণ করে বেড়ায়। ফুলের একেবারে বাইরের স্তবকটি

চিত্র ২৫ : আম গাছ ও তার বিভিন্ন অংশ

৫টি সমান অংশ (বৃত্যংশ) নিয়ে তৈরী। এদের একত্রে বলে বৃতি। বৃতি নিচের দিকে কিছুটা জোড়া। বৃতির পরের স্তবকটির নাম **দলমণ্ডল**। এরও ৫টি অংশ আছে। প্রত্যেকটি অংশকে বলা হয় পাপড়ি। পাপড়িগুলি আলাদা আলাদা থাকে। আমের ফুল দ্বিলিঙ্গ। পুংকেশরটি ৫টি ৫টি করে দুটো গোছায় সাজান থাকে। গর্ভাশয়ে একটি কুঠরী থাকে। তাতে থাকে একটি

মাত্র বীজ। ঐ বীজ থেকে নতুন করে চারা হয়। সেই চারা আবার বড় গাছে পরিণত হয়। আম গাছ বহু বছর বাঁচে।

আম ডালপালা থেকে এক বোঁটায় একটি বা অনেকগুলি এক এক থোকায় ঝুলতে থাকে। পাকা খোসা ছাড়ালে নরম রসাল শাঁস বেরিয়ে পড়ে। শাঁসই আমাদের খাদ্য। শাঁসের মধ্যে থাকে আঁটি। আঁটিটাই সত্যিকারের বীজ। এর খোসাটা বেশ শক্ত আর পুরু। এই খোসাটা ছাড়িয়ে দেখলেই মোটা লম্বাটে যে জিনিসটা বেরিয়ে আসে তাকে বলে বীজপত্র। চলতি কথায় আমরা বলি কুসি।

কলমের আমগাছ আঁটির গাছ থেকে অনেক সুস্বাদু ফলের জন্ম দেয়। বসন্তেই গাছের নতুন বৃদ্ধি শুরু হয়। পরের শীতে গাছে মুকুল আসে। তা থেকে জন্মায় ফল। ফল পাকতে ৫ থেকে ৬ মাস সময় লাগে। এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে আম পাকতে শুরু করে। পাকা আম জাল দিয়ে পাড়তে হয়। হাত দিয়ে পাড়া আম সবচেয়ে ভাল। অবশ্য অনেক সময় পাকার মুখে কাঁচা আম পেড়ে পাকান হয়। বেশী কাঁচা আম টক। ঘরে খড় বিছিয়ে তাতে কাঁচা আমগুলি কিছুদিন রাখলেই আম পেকে যায়, মিষ্টি হয়। আমের জাত হিসাবে ফলনের তারতম্য হয়। সুস্বাদু আমগুলির মধ্যে আলফানসো, ল্যাংরা, হিমসাগর, গোলাপখাস, ফজলী, কৃষ্ণভোগ, বোম্বাই, মালদহ ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাঁচা আম থেকে চাট্‌নি, আচার আর পাকা আম থেকে আমসত্ত্ব হয়। এদেশের পাকা আম এত ভাল যে বিদেশে এর খুব চাহিদা আর সুনাম আছে। ফলে প্রতি বৎসর বর্তমানে বহু ভাল জাতের আম বিদেশে রপ্তানি হয়।

(গ) জাতীয় পাখী ময়ূর

ছবিতে শ্রীকৃষ্ণের মাথার মুকুটে যে পালক দেখা যায় তা কোন্ পাখীর জান কি? পালকগুলি হল ময়ূরের। এই ময়ূরই ভারতের জাতীয় পাখী। কেননা এমন বাহারে আর রংচংয়ে পাখী আর দ্বিতীয় নাই। বনকে সুন্দর করে তোলে এরা। তাইতো ময়ূরকে জাতীয় পাখীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অনেকের বাড়ীতে সখ করে ময়ূর পোষা হয়। চিড়িয়াখানায় গেলে তোমরা নানা রকমের ময়ূর দেখতে পাবে। এমনিতে ময়ূর সব জায়গায় দেখা যায় না। তবে

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি আর বাঁকুড়া জেলায় এই সুন্দর পাখীটি প্রচুর দেখা যায়। আর বাংলার বাইরে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশেও প্রচুর ময়ূর দেখা যায়।

ময়ূরের যত বাহার পালকে আর মাথার ঝুঁটিতে। লেজসমেত দেহটি প্রায় ১.২৩ সেণ্টিমিটার লম্বা। শুধু পিছনের পালকই তো প্রায় দেহের সমান।

চিত্র ২৬ : ময়ূর পেখম মেলেছে (এই অবস্থায় ইহাকে অতি সুন্দর দেখায়)

ময়ূরের লেজ খুব সুন্দর, বিশেষ করে যখন নাচ শুরু করে। মনে রাখবে যাকে আমরা লেজের পালক বলে ভুল করি আসলে তা হল ধড়ের পালক! আকাশে মেঘ দেখলে পেখম মেলে ময়ূর নাচে। তখন আধখানা চাঁদের মত পেখমের আকার হয়। ময়ূরের ডানাও বেশ লম্বা। আর ঠোঁটটি শক্ত ও বাঁকা। ময়ূর কেবল পেখম মেলে নাচতে পারে। ময়ূর পুচ্ছ ছড়িয়ে দিলেই তাকে

পেখম বলে। পেখমের রংয়ের বাহার দেখবার মত। ময়ূরী নাচতে পারে না। কেননা তাদের এতবড় পালক নাই! ময়ূরের আকারও ময়ূরীর চেয়ে অনেক বড়। ময়ূরের মাথায় আবার একগোছা পালকের মুকুট থাকে। এইসব দেখেই ময়ূর ও ময়ূরী চেনা যায়। রংয়ে অবশ্য এদের বিশেষ তারতম্য নাই। ময়ূরের পাখার পালকের রং বাদামী, গলার আর মাথার ঝুঁটির রং নীল। পেখমের প্রত্যেক পালকে চোখ আঁকা। তাই ময়ূরকে সহস্রলোচন বলে। একটি পরিণত ময়ূরের ওজন হয় প্রায় পাঁচ কিলোগ্রাম। ময়ূরের দুটি পা আছে। পা দুটির গঠন বেশ মজবুত।

ছোট ছোট দলে ময়ূর ঘুরে বেড়ায়। ছোটনদী বা জলধারার শস্যক্ষেত্রের আশপাশে যেখানে পাহাড় আছে এমন জঙ্গলেই ময়ূর বাস করার জন্যে বেশী পছন্দ করে। ময়ূর অত্যন্ত বুদ্ধিমান! অতি সতর্কভাবে এরা ঘোরাফেরা করে। যদি কোন বাঘের মত হিংস্র জন্তু ওদের আস্তানার কাছাকাছি আসে তবে এরা চীৎকার করে সোরগোল তোলে। ফলে নিরীহ পশুপাখী এমনকি মানুষও সতর্ক হয়ে যায়। তারা ঐ হিংস্র জন্তুর চোখের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে অথবা পালিয়ে বাঁচে। ময়ূর তেমন ভাল উড়তে পারে না। তবে এরা বেশ দৌড়োতে পারে। এমনকি ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়েও বেশ জোরে হেঁটে যেতে পারে।

সকাল সন্ধ্যাই হচ্ছে ময়ূরের পছন্দমত ঘুরে বেড়াবার সময়। ধান ক্ষেত বা অন্যান্য ফসলের ক্ষেত-খামারে ঘুরে বেড়ানো এরা পছন্দ করে। কেননা ক্ষেত-খামারের ফসলই এদের প্রিয় খাদ্য। অবশ্য এক এক সময় এদের ছোট-খাট পোকামাকড়ও খেতে দেখা যায়। এমনকি সময়বিশেষে ছোট সাপকেও এরা খেয়ে ফেলতে পারে! শিকারী দেখলে এরা উড়ে গিয়ে উঁচু ডালে লুকিয়ে পড়ে। ময়ূর দেখতে সুন্দর তবে এদের স্বর মিষ্টি নয়। ময়ূরের ডাককে 'কেকা' বলে। ময়ূর বেশ পোষ মানে। অনেকের বাড়ীর বাগানে অথবা খড়ের চালে এদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

ঘন পাতার আড়ালে ঢাকা কোন ডালে বসেই এরা সারা রাত কাটিয়ে দেয়। ছোটনদী, ঝিল প্রভৃতির ধারে ঘাসবনে এরা ডিম পাড়ার জন্যে বাসা তৈরী করে তাতে ডিম পাড়ে। একসঙ্গে দুটি থেকে পাঁচটি বা তারও বেশী ডিম পাড়ে। হাঁসের ডিমের মত ডিমের আকার। ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। তারা বড় না হওয়া পর্যন্ত ময়ূরী এদের দেখাশোনা করে। বর্ষাকালে, মেঘের আনাগোনা শুরু হলে ময়ূর পেখম মেলে আনন্দে নাচতে শুরু করে। এ দৃশ্য দেখে আনন্দ পায় না এমন মানুষ পৃথিবীতে নাই। ময়ূর ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বাঁচে।

(ঘ) জাতীয় পশু বাঘ

তোমরা অনেকেই হয়তো বাঘ দেখেছো। যারা শহরে বাস কর তারা তো চিড়িয়াখানায় গিয়ে নিশ্চয়ই নানা রংয়ের নানা আকৃতির বাঘের সঙ্গে পরিচিত হয়েছ। এরা সব বিড়াল জাতীয় প্রাণী। নেকড়ে, জাগুয়ার, কাল প্যান্থার নানা রকমের বাঘের নাম করা যায়। তবে বাঘের রাজা হল **রয়েল বেঙ্গল টাইগার**। যারা চিড়িয়াখানায় যাওনি তারা বাঘ সার্কাসে দেখে থাকবে। আর না দেখে থাকলে একদিন চিড়িয়াখানায় এস না কেন?

রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা যায়।

চিত্র ২৭ ঃ রয়েল বেঙ্গল টাইগার

সুন্দরবন ছাড়াও এদের তরাই ও ডুয়ার্সের জঙ্গলে দেখা গেছে। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর থেকে শুরু করে আসাম পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশই এদের বাসস্থান। মহীশূরের সিমোগা অঞ্চলেও এদের দেখা যায়। এই বাঘের গায়ে হলদে কালো ডোরা কাটা লম্বা দাগ দেখে সহজেই এদের চেনা যায়। এই রকমের রংয়ের উজ্জ্বল বাহার—সে তো নিজেকে ঐসব গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে দেহের উপরের রংয়ের চেয়ে নিচের দিকের রং ফিকে। পেটের কাছে তো ঐ রেখে শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যেই। তবে লক্ষ্য করলে দেখবে রং প্রায় সাদা হয়ে এসেছে। এই জায়গাতেই কেবল ডোরা কাটা দাগ থাকে

না। বাঘ খুব হিংস্র। থাবার মধ্যে লুকোনো নখ আর দাঁত এদের বড় অস্ত্র। বাঘের থাবার এত বশী জোর যে কল্পনা করা যায় না। থাবায় দুই ইঞ্চির মত লম্বা বাঁকানো নখ থাকে। এদের ছেদক দাঁত তিন ইঞ্চির মত লম্বা। বাঘের ঘ্রাণশক্তি তত জোরালো নয়। এদের দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি প্রখর।

বাঘ গভীর বনে বাস করে। এদের প্রিয় খাদ্য* হরিণ। অবশ্য ভল্লুক, গরু, ছাগল, ভেড়া, সজারুর মত প্রাণীকেও এরা রেহাই দেয় না। মানুষকে কিন্তু সাধারণতঃ এরা এড়িয়ে চলে। যদি এদের খুব বিরক্ত করা হয় বা অন্য কোন খাদ্য যোগাড় করা সম্ভব হয়নি এমন অবস্থা ঘটে তবে বাঘেরা সোজা লোকালয়ে চলে যায় এবং মানুষের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বন্দুকের গুলি খাওয়া বাঘ সাধারণতঃ মানুষ খেকো হয়। একবার মানুষের রক্ত-মাংসের স্বাদ পেলে তা তারা ভুলতে পারে না। তখন তারা বারবার লোকালয়ে এসে মানুষ ধরার সুযোগ খোঁজে। বুড়ো বাঘ অবশ্য এমনিতেই সহজে শিকার পাবার আশায় লোকালয়ের কাছে ঘুরঘুর করে।

সাধারণতঃ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেহ ২·৯০ মিটার লম্বা হয়। কখনও কখনও তা ৪ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। লেজের দৈর্ঘ্য প্রায় এক মিটারের মত। এদের উচ্চতা প্রায় ১ মিটার এবং ওজন কমবেশী ২১৬ কেজি থেকে ২৫৮ কেজি।

বাঘ একাই বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। সময় সময় মেয়ে বাঘ ও পুরুষ বাঘ একত্রে ঘুরে বেড়ায়। এরা খুব জোরে দৌড়োতে পারে। মেয়ে বাঘ খুব চতুর আর সন্দেহপরায়ণ। ১৫ সপ্তাহ ধরে পেটে থাকার পর বাঘের বাচ্চা হয়। একসঙ্গে ২-৪টি বাচ্চা হয়। যতদিন মায়ের উপর খাবারের জন্যে নির্ভর করে ততদিন কেবল মায়ের সঙ্গে বাচ্চারা ঘোরাঘুরি করে। যখন নিজেই নিজের খাবার যোগাড় করার ক্ষমতা লাভ করে তখন বাচ্চারা মায়ের সঙ্গ ত্যাগ করে এবং নিজের উপর নির্ভর করেই বাঁচতে শুরু করে।

রয়েল বেঙ্গল ছাড়া আরো অনেক রকম বাঘ আছে। চিতা বাঘের নাম শুনেছ। চিতা গাছে চড়তে ওস্তাদ। এছাড়া আছে পুমা আর জাগুয়ার। পুমাকে কাল পান্থার বা সাদা পান্থারও বলা হয়। সাদা বাঘও তোমরা অনেকেই দেখেছ চিড়িয়াখানায়। রেওয়া অঞ্চলে এদের দেখা যায়। বাঘের সাহস ও শক্তি তেজ সৌন্দর্য ভারিক্কি চালচলন আছে বলে এরা বনের রাজা। এত গুণ থাকার জন্যেই বাঘকে জাতীয় পশুর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

---

* শুধু মাংস নয়, চামড়া-চুল সমেত মাংসই এদের বেশী পুষ্টি যোগায়।

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। পরিবেশে যাহা কিছু দেখা যায় তাহাদের কয় ভাগে ভাগ করা যায়? ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

২। জীব ও জড় বলতে কি বোঝ? তোমার পরিবেশে তুমি কিভাবে ইহাদের সহিত প্রথম পরিচিত হইলে তাহা উদাহরণ যোগে বুঝাইয়া দাও।

৩। জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায় কিভাবে তাহা উল্লেখ কর।

৪। 'প্রোটোপ্লাজম সত্যিই এক রহস্যময় পদার্থ'—এই উক্তিটি কি তুমি বিশ্বাস কর? বিশ্বাস করিলে তাহার কারণ কি উদাহরণ দিয়া বোঝাও।

৫। মৃত্যু ঘটিলে জীব জড় পদার্থে পরিণত হয় কেন? এ বিষয়ে তোমার ধারণা কি?

৬। গাছপালার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় তুমি কি কি বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত হইলে তাহা সংক্ষেপে বল।

৭। বিভিন্ন প্রাণীর যে নিজস্ব আকার ও আয়তন এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং ইহার সাহায্যেই যে এক প্রাণীকে অন্য প্রাণী হইতে আলাদা করা যায় তাহা আলোচনা করিয়া বুঝাও।

৮। পদ্ম কোথায় জন্মায়? পদ্মকে জাতীয় পুষ্পের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে কি? এই ফুলটি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৯। কোন্ ধরনের মাটিতে আমের ফলন বেশী হয়? কতরকম আমের সহিত তুমি পরিচিত? আমের উপর একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

১০। জাতীয় পাখী বলিতে কাহাকে বোঝায়? এই পাখীটি কোথায় পাওয়া যায়? ইহার প্রশ্রীতি সম্বন্ধে যাহা জান লেখ?

১১। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বৈশিষ্ট্য কি? ইহাকে কোথায় পাওয়া যায়? ইহার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

[Objective Test]

Yes or No Type :

১২। প্রতিটি প্রশ্নের পাশে 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখিয়া উত্তর দাও:

(ক) জড়ের মধ্যে জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম থাকে কি?

(খ) গাছের মূলে কি ক্লোরোফিল থাকে?

(গ) শেওলা কি নিজের খাদ্য নিজেই তৈয়ারী করিয়া লয়?

(ঘ) ছত্রাকের দেহ কি কাণ্ড, পাতা ও মূলে বিভক্ত?

(ঙ) মস কি ফুল ধারণ করে?

(চ) কাঁঠাল গাছ ও বেগুন গাছ কি একই গোষ্ঠীর উদ্ভিদ?

১৩। এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) সমুদ্রের ধারে কোন্ ধরনের গাছ বেশী জন্মায়?

(খ) মৌমাছি, আরশোলা, চিংড়ি কোন্ জাতীয় প্রাণী?

(গ) সূর্যের সহিত তোমার কিসের সম্পর্ক?

(ঘ) জাতীয় পশুর নাম কি?

(ঙ) ময়ূর কখন পেখম মেলে?

১৪। শুদ্ধ করিয়া লেখ :

(ক) আম পাতার বৃন্তটি আর পাতার আগাটি স্থূলে।

(খ) বৃতির পরের স্তবকটির নাম বৃতাংশ।

(গ) বসন্তেই গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

(ঘ) ময়ূর পাখীর ছানা খেতে ভালবাসে।

(ঙ) কলমীশাক অবলম্বনকে-জড়াইয়া উপরে উঠে?

১৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) জীবজগৎ বলতে শুধু — বোঝায় না। — যাদের — আছে তারা আওতায় পড়ে।

(খ) গাছের — ও — সহজ রংয়ের একরকম — আছে। কণাগুলোকে বলে —।

(গ) পাতাঝাঁঝির ছোট ছোট — তৈরী করে জলের — ধরে আর খায়।

(ঘ) জমিতে পাকানো পাকানো মাটির — দেখলেই — মল বলে চিনতে হবে।

(ঙ) চওড়া — দিয়ে মাটি — শামুক — করে।

(চ) মাছের দেহ — মত। এদের অনেকের দেহেই — আছে, আছে, —; — আর —।

(ছ) সূর্য — উৎস। সূর্যই — কে গাছপালা খাদ্য হিসাবে দেহে — ফেলে। সূর্যই — জন্য দায়ী।

(জ) আমাদের —, জল ছাড়া — অসম্ভব।

———

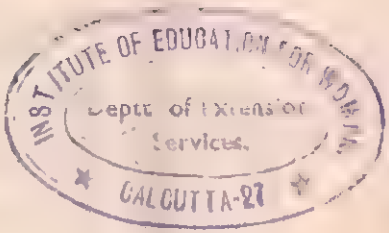

৩ ছাত্রের ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত

[Observation of living objects with an eye to the training of the sense organs of the students leading to general inference

জৈব পরিবেশ ও বিভিন্ন জীবের সঙ্গে তোমার মোটামুটি পরিচয় হয়েছে। এবার আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুলতে হবে। তখন এই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই তাদের চেনা ও জানা সহজ হবে।

চোখ দিয়ে আমরা দেখি, কান দিয়ে শুনি নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকি, জিব দিয়ে স্বাদ নিই, আর শরীরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে স্পর্শ অনুভব করি। এগুলিই আমাদের ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় মাধ্যমেই আমরা সব কিছু শিখি ও জানি।

দেখে শেখা

বিভিন্ন জীবের আকৃতি, বর্ণের পার্থক্য চোখে দেখেই ধরা যায়। এই আকৃতি ও প্রকৃতির পার্থক্যের উপর নির্ভর করে জীবকে প্রধানতঃ উদ্ভিদ ও প্রাণীতে ভাগ করা হয়েছে। তাই উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হলেই উভয়কে আলাদা করে চিনতে পারবে। প্রথমে আমরা আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়েই আলোচনা করব।

চিত্র ২৮

বহিরাকৃতির পার্থক্য

তুমি একটি জীব আবার গাছও জীব। কিন্তু তোমার সঙ্গে গাছের বাইরের আকারের কোথাও মিল আছে কি? না, কোথাও মিল খুঁজে পাবে

না। তাই সহজেই তুমি নিজেকে গাছ থেকে আলাদা ভাবতে পার। **জীব-জগতের মধ্যে তুমি হলে প্রাণী আর অন্যটি হলো উদ্ভিদ।** এই উদ্ভিদ ও প্রাণি জগৎ বৈচিত্র্যে ভরা। তাই আকারগত মিল ও অমিলের উপর নির্ভর করে জীবকুলকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা জীববিজ্ঞানীর ধর্ম। উদ্ভিদজগতের কথা ধরা যাক্।

তোমার বাগানে আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল, সুপারি, কলা, পেঁপে, জবা, গোলাপ, দোঁপাটি, যুই, টগর, কুমড়ো, লাউ, ঝিঙে; উচ্ছে প্রভৃতি কত রকমের গাছ রয়েছে। এরা সকলেই উদ্ভিদজগতের বাসিন্দা। তবু দেখ এদের মধ্যে কত পার্থক্য। এদের আকৃতি বিভিন্ন ধরনের। এদের ফুল, ফল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা, মূল ইত্যাদির আকৃতিও বিভিন্ন। এই বিভিন্ন আকৃতির গাছগুলির বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করে চিনে রাখলে, তাদের সম্বন্ধে একটা ধারণা তোমার মনের মধ্যে গেঁথে যাবে। এরপর যেখানেই এই আকৃতির গাছগুলো দেখবে অতি সহজেই তাদের চিনতে পারবে। বলতে পারবে কোন্‌টা আম, কোন্‌টা জাম, কোন্‌টা তেঁতুল, কোন্‌টা পুঁই, কোন্‌টা গোলাপ ইত্যাদি। এইভাবে বহিরাকৃতির উপর নির্ভর করে উদ্ভিদজগতের অনেকটাই তোমার জানা হয়ে যাবে।

এবার প্রাণিজগতের দিকে তাকাও। তুমি একটি প্রাণী। জীবজগতের

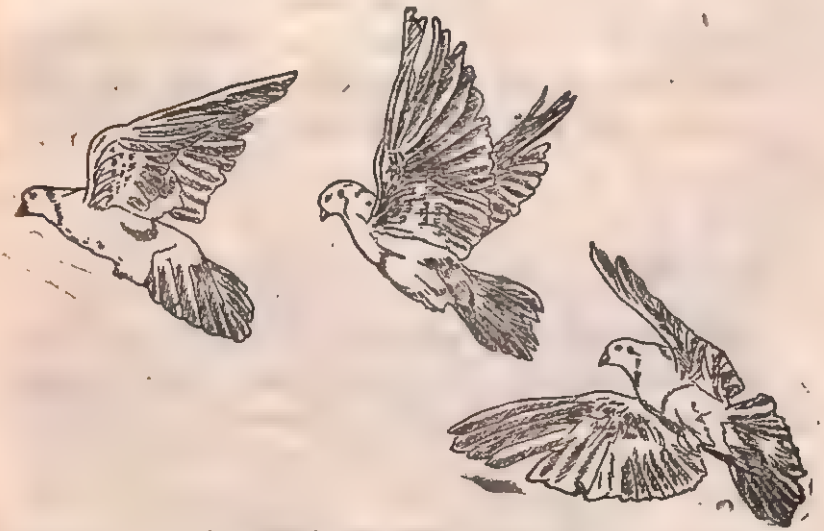

চিত্র ২৯ ঃ উড়ন্ত অবস্থায় পায়রার আকৃতি

সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। নিশ্চয় তোমার আকৃতি কেমন তা তুমি জান। আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, চেনা-অচেনা নানা ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করে তারাও যে তোমার

মত মানুষ সে সম্বন্ধে পুরাপুরি জ্ঞান লাভ করতে পার। এইবার পৃথিবীর যে কোন পরিবেশে তোমার আকৃতির জীব দেখলেই তাকে মানুষ বলে নিশ্চয় চিনবে। এইভাবে যখন মাছের আকৃতির সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে তখন সেই আকৃতির জীব দেখলেই তাকে মাছ বলবে। ঠিক তেমনি ব্যাঙ, সাপ, টিকটিকি, পাখী ইত্যাদি মেরুদণ্ডী প্রাণীর আকৃতির সঙ্গে পরিচয় থাকলেই যে কোন পরিবেশে, তুমি তাদের চিনে নিতে পারবে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রেও তাই (চিত্র ২০ দেখ)। সেখানে স্পঞ্জের আকৃতির সঙ্গে কৃমির বা কেঁচোর বা পোকামাকড়ের বা শামুকের বা তারামাছের কোনই মিল থাকে না। **তাই আকার দেখে চেনা থাকলে সহজেই একের থেকে অন্যকে আলাদা করা যায়। এই চিনে রাখাটাই হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।** অনেক সময় আপাত-দৃষ্টিতে কোন কোন প্রাণী দেখতে একরকম হয় বটে। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে এদের মধ্যে আকৃতির পার্থক্য ঠিক ধরা পড়বেই। কৃমি, কেঁচো, কেন্নো ইত্যাদি দেখে তোমার হয়ত সব একই রকমের প্রাণী বলে মনে হবে। কিন্তু মোটেই তা নয়। এদের সকলের দেহই লম্বা বটে কিন্তু ভাল করে দেহের গঠন দেখ। কেঁচোর দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত কিন্তু কৃমির দেহ সেরকম নয়। আবার কেন্নোর দেহে রয়েছে কয়েক জোড়া পা, কৃমি বা কেঁচোর সেরকম নাই। শুধু এই পার্থক্যই নয়। খুঁটিয়ে দেখলে আরও অনেক পার্থক্য জানতে পারবে। এখন আর নিশ্চয় এগুলিকে একই রকমের প্রাণী বলে ভাববে না। ভাল করে চিনে রাখলে অন্য কোথাও এই ধরনের প্রাণী দেখলে নিশ্চয় চিনবে। তবে **মোটামুটি আকারগত মিল দেখে জীবগুলিকে এক একটি সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে;** যেমন—মানুষ, কুকুর, গরু, ভেড়া, সাপ, ব্যাঙ, পাখী, মাছ ইত্যাদি।

বর্ণগত পার্থক্য ঃ

এইবার বর্ণের অর্থাৎ দেহের রংয়ের দিকে দেখ। চেনা সব গাছের পাতা ও কাণ্ডের রং সবুজ। তাই স্বাভাবিকভাবেই তোমার সিদ্ধান্ত হবে যে গাছের রং সবুজ। কিন্তু ব্যাঙের ছাতা ইত্যাদি কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যাদের রং সবুজ নয়। তাদেরও চিনে রাখতে হবে। লক্ষ্য করলে দেখবে এরা পচা ফল, রুটি, চামড়া, কাঠ, সারগাদা বা অন্য কোন মরা, পচা জীবের উপর জন্মায়। তাই এই সিদ্ধান্ত করা তোমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয় যে, যাদের রং সবুজ নয় তারা অন্য উদ্ভিদের মত সাধারণ মাটিতে জন্মায় না।

বিভিন্ন ধরণের পাখী

এছাড়া বিভিন্ন গাছের ফল, ফুলও নিশ্চয় তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক সময় এই ফল ফুলের রং দেখেই তুমি গাছকে চিনতে পারবে।

এই বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রাণিজগতেও আছে। বিভিন্ন পাখীকে চেনবার উপায় প্রধানতঃ তার রং। তোমার বাগানে এক ঝাঁক পাখী এসে বসল। যদি তুমি তাদের রংয়ের সঙ্গে পরিচিত থাক তবেই কোন্‌টা কোন্‌ পাখী তা চিনতে পারবে। তাই এসো রংয়ের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি পাখীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। এই রং দেখে সময় সময় মেয়ে বা পুরুষ পাখীও চেনা যায়।

যে পাখী দেখতে বেশ ছোট এবং যার রং খয়েরি, চোখের কাছে খানিকটা সাদা দাগ আর গলার কাছে কালো রংয়ের বেড় আছে সেটা হল **পুরুষ চড়ুই।** কিন্তু **মেয়ে চড়ুইয়ের** চোখে সাদা দাগ নাই, গলায় কালো রংয়ের বেড়ও নাই এবং রংটাও ফিকে। তাই এখন মেয়ে ও পুরুষ চড়ুই চিনতে নিশ্চয় তোমার অসুবিধা হবে না। এমন পাখী যদি দেখ যার মাথা, গলা, পিঠের রং চক্‌চকে কালো, কিন্তু পেটের দিকটার রং সাদা আর লেজের পালকের কয়েকটি কালো বাকীগুলো সাদা, তাহলে জানবে এরা হল **পুরুষ দোয়েল** কিন্তু **মেয়ে দোয়েল**-এর রংয়ের বাহার বিশেষ থাকে না। **টিয়া পাখী** নিশ্চয় চেন। তার রং সবুজ, ঠোঁট লাল। আবার যদি দেখ ঐ সবুজ লাল ঠোঁটবিশিষ্ট পাখীর গলার পিছনে গোলাপী রংয়ের সরু একটি বেড় আছে এবং দুটো কালো দাগ সেই বেড় থেকে দু দিকে ঠোঁট পর্যন্ত চলে গেছে তখনই তাকে **চন্দনা** বলে চিনে রেখ। আবার যে পাখীর রং কালো কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে নীলচে আভা, চোখের উপর আছে উজ্জ্বল রংয়ের চামড়া আর ঠোঁট লালচে হলেও পা ফিকে, তাকে বলে **ময়না।** **কোকিলের** রংও কালো কিন্তু চোখ দুটো তার লাল। মেয়ে কোকিলের গায়ে কিন্তু ছাই রংয়ের উপর সাদা ফোঁটা থাকে। **বুলবুলির** মাথায় থাকে কালো ঝুঁটি। এদের চোখের পাশে যে ছোট পালক-গুলি আছে সেগুলো কিন্তু সাদা। এদের ডানার পালক ধূসর রংয়ের তবে ডানার **দিকটা কালো।** আবার **বৌ-কথা-কও** পাখীর শরীরের উপরটা ছাই রংয়ের কিন্তু নিচেটা পিঙ্গল। **বসন্ত বাউড়ির** শরীরের রং সবুজ তবে নিচের দিকটা লাল। আর **মাছরাঙার** দেহের রং লাল। এর ডানায় সবুজের আভা আছে। **গো বকের** রং কিন্তু ফুট ফুটে সাদা। তবে এর পা কালো আর ঠোঁট **লালচে-হলদে।** আর কালো কাক তো তোমাদের সকলেরই পরিচিত। তাই রং দেখে পাখী চেনা সম্ভব। কিন্তু অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে এই বর্ণ-বৈচিত্র্য থাকলেও তার উপর নির্ভর করে তাদের চিনতে যাওয়া ঠিক নয়। কারণ

কালো রংয়ের কুকুর যেমন দেখা যায় তেমনি কালো গরু বা কালো বিড়ালও বিরল নয়। মানুষও কালো হয়। আবার প্রজাপতির নানা রংয়ের বাহার

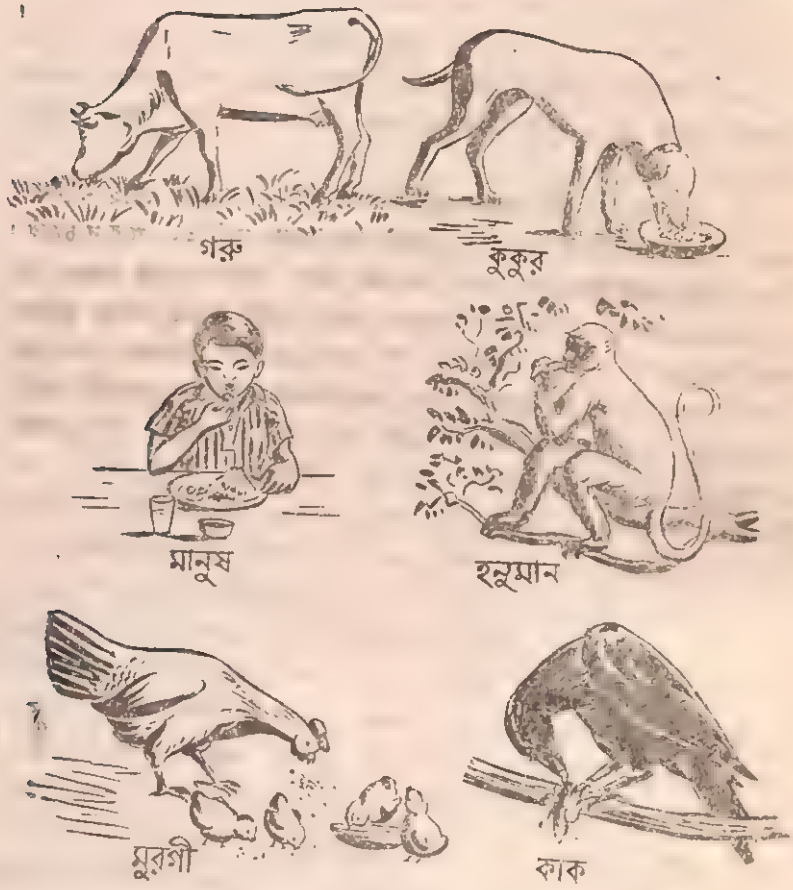

চিত্র ৩০ ঃ বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি

নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো। তাই তাকে নির্দিষ্ট রং দিয়ে চেনবার চেষ্টা করা বৃথা। তবে কালো মোষ, ডোরাকাটা বাঘ, সাদা খরগোস ইত্যাদি দেখে চেনা সম্ভব। তাই মনোযোগ দিয়ে দেখলে আকৃতি ও রং দেখে অনেক জীবকেই চিনতে পারবে।

প্রকৃতিগত পার্থক্য ঃ বাঁচতে গেলেই জীবকে বিশেষ কয়েকটি কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এটাই জীবের বৈশিষ্ট্য। এই কাজের রীতি-নীতি সব জীবের একরকম নয়। সেই বিভিন্ন কাজের দিকেই এবার চোখ ফেরাও।

খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি ঃ খাদ্য ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না। প্রত্যেক

চিত্র ৩১ ঃ পোকাকে ফাঁদে ফেলছে পতঙ্গভূক (সূর্যশিশির) উদ্ভিদ

জীবকেই খাদ্যগ্রহণ করে দেহের প্রয়োজন মেটাতে হয়। প্রতিটি জীব কিন্তু একইভাবে এই খাদ্য নেয় না। কিভাবে বিভিন্ন জীব খাদ্য খায় বা গ্রহণ করে সেই দিকে লক্ষ্য কর।

প্রথমতঃ গাছকে দেখ। একই স্থানে দাঁড়িয়ে গাছ কেমন বেড়ে ওঠে।

খাদ্যের জন্যে তাকে মোটেই ছুটোছুটি করতে হচ্ছে না। সে তার খাদ্য কিভাবে পায় সে চিন্তা নিশ্চয় তোমার মনে জাগবে। তোমার পরিচিত অধিকাংশ উদ্ভিদকে লক্ষ্য করলেই দেখবে তার একটা অংশ মাটির মধ্যে কিছু দূর চলে গেছে। উদ্ভিদের এই অংশের নামই শিকড় বা মূল। এই শিকড় বা মূল উদ্ভিদকে যেমন একদিকে মাটির সঙ্গে আটকে রাখে অন্যদিকে মাটি থেকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্য রস শুষে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পাঠায় (চিত্র ৫ দেখ)। পাতার সাহায্যে উদ্ভিদ কিভাবে শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরী করে তা তোমরা আগেই জেনেছো; এখন তুমি অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে আসবে যে, সব সবুজ উদ্ভিদই মোটামুটি একইভাবে খাদ্য গ্রহণ করে। তবে পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদগুলির খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি মোটেই সাধারণ উদ্ভিদের মত নয়। পোকাকে ফাঁদে ফেলে আটকে তার দেহকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করবার ব্যবস্থা তাদের থাকে (চিত্র ৩১ দেখ)। আর পরজীবী স্বর্ণলতাও তার খাদ্য সোজাসুজি আশ্রয়দাতার দেহ থেকে টেনে নেয়।

প্রাণিজগতে এই খাদ্য গ্রহণের পদ্ধতি কিন্তু লক্ষ্য করার মত। সব প্রাণীর খাদ্য হয় উদ্ভিদ না হয় অন্য কোন প্রাণী। তুমি, আমি এবং তোমার আমার মত আরও কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা উদ্ভিদও খায় আবার অন্য প্রাণীর মাংসও খায়। কিন্তু সব প্রাণীর খাবার রীতি মোটেই একরকম নয়। যেমন মানুষ, বাঁদর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদি প্রাণীর খাদ্যকে হাতের সাহায্যে মুখের কাছে নিয়ে আসে। আবার দেখ গরু, ছাগল, ভেড়া, বিড়াল, কুকুর, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণী সোজাসুজি খাদ্যের উপর মুখ লাগিয়ে খাদ্য খায় (চিত্র ৩০ দেখ)। কিন্তু নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো কুকুর, বিড়াল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি প্রাণী অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করতে থাবার ব্যবহার করে। পুকুরে কিছু মাছের খাদ্য ছড়িয়ে দিলেই মাছের খাবার পদ্ধতি চোখে পড়বে। দেখবে ওরা জলের মধ্যে থেকে হাঁ করে কেমন সোজাসুজি খাদ্য গিলে ফেলে।

ব্যাঙ-এর খাদ্য সংগ্রহের রীতি কিন্তু বেশ দর্শনীয়। ব্যাঙ-এর খাদ্য পোকামাকড়। এই পোকামাকড় ধরতে ব্যাঙ তার জিবের সাহায্য নেয়। লক্ষ্য করলেই দেখবে ব্যাঙ তার খাদ্যের কাছে আস্তে আস্তে লাফিয়ে এগিয়ে আসে। তারপর একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে হঠাৎ তার লম্বা জিবটা বার করে সোজা খাদ্যের উপর ছুঁড়ে দেয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে জিবটি মুখের মধ্যে টেনে নেয়। সেই সঙ্গে পোকাটিও মুখের মধ্যে চলে আসে। এই দৃশ্য দেখে ব্যাঙের জিবের অবস্থা সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ নিশ্চয় তোমার হবে। লক্ষ্য করে দেখ ব্যাঙের জিবের সামনের দিকটা মুখের মধ্যে আটকানো কিন্তু পিছনের দিকটা

খোলা। ঠিক আমাদের জিবের উল্টো ব্যবস্থা। ফলে সমস্ত জিবটাই ব্যাঙ মুখের বাইরে আনতে পারে। জিবের আঠালো পদার্থে পোকামাকড় আটকে যায়। ফলে সহজেই ব্যাঙ জিব দিয়ে শিকার ধরে।

চিত্র ৩২ : ব্যাঙের জিব ছুঁড়ে পোকা ধরার পদ্ধতি

নিশ্চয় দেখেছো টিকটিকি কেমন আস্তে আস্তে তার খাদ্যের দিকে এগিয়ে

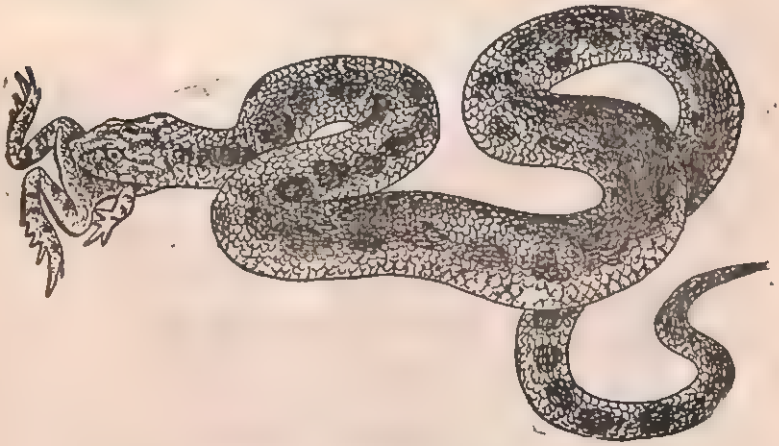

চিত্র ৩৩ : সাপের ব্যাঙ খাওয়া

যায় (চিত্র ৯ দেখ)। তারপর হঠাৎ তার উপর লাফ দিয়ে তাকে মুখ দিয়ে ধরে। সাপের খাওয়াও লক্ষ্য করো! দেখবে তার দেহের সবচেয়ে বড় বড় জন্তু কেমন অনায়াসে মুখ দিয়ে ধরে গিলে খাচ্ছে।

পাখীর খাদ্য গ্রহণের পদ্ধতিও লক্ষ্য করার মত। পাখীর খাদ্য শিকার ও খাদ্য গ্রহণে সাহায্য করে লম্বা ঠোঁট ও পা। লক্ষ্য করে দেখ কোন কোন পাখীর ঠোঁট অনেক বড় ও বঁড়শির মত, কারুর সরু ছোট, কারুর বাঁকা, কারুর বা বাঘের একটা বড় নখের মত। তাই বেশ ভাল করে লক্ষ্য করলে এদের

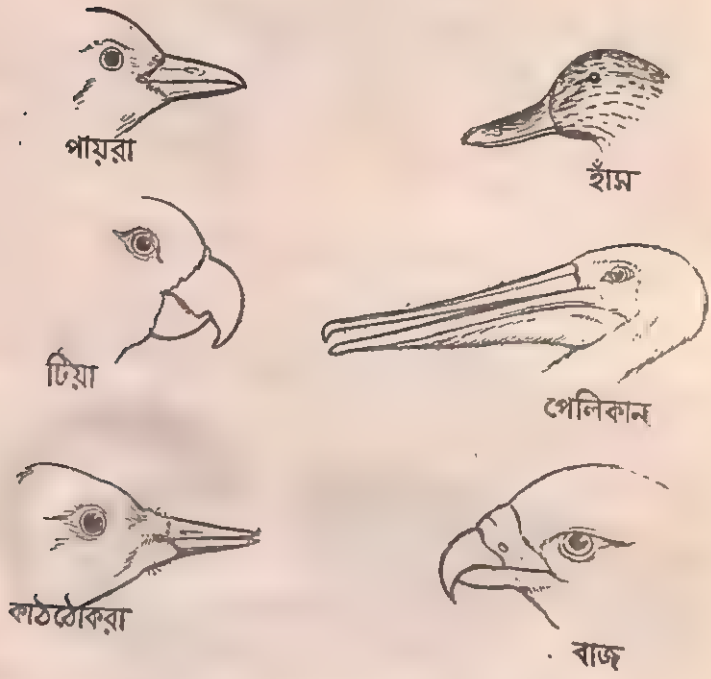

চিত্র ৩৪ ঃ বিভিন্ন পাখীর নানা রকমের ঠোঁট

ঠোঁটের এই পার্থক্য তোমার চোখে পড়বে। এর কারণ কি নিশ্চয় জানতে চাও। লক্ষ্য করে দেখ এই বিভিন্ন ঠোঁটবিশিষ্ট পাখীর খাদ্যও একরকম নয়। কেউ খায় পোকামাকড়, কেউ খায় পাকা ধান, নানা শস্য, কারুর খাদ্য আবার মাছ, কারুর আবার ব্যাঙ, ইঁদুর, হাঁস ইত্যাদি। কেউ ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খায়, কেউ আবার ছোঁ মেরে শিকার ধরে। তাই তোমার সিদ্ধান্ত হবে যে

খাবারের প্রকারভেদ ও খাবার ধরার রীতির পার্থক্যের জন্যেই বিভিন্ন পাখীর ঠোঁটের আকৃতিতে এত পার্থক্য। এই ঠোঁটের সঙ্গে পায়ের নখের পার্থক্যও লক্ষ্যকরে দেখ।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দিকে দেখ। নিশ্চয় বাগানে কেঁচোর বিষ্ঠা লক্ষ্য করেছো। কেঁচো মাটি খায় আর বিষ্ঠারূপে মাটিই ত্যাগ করে। এই মাটির জৈব পদার্থই তার খাদ্য। প্রায় একই রকম দেখতে জোঁকের খাদ্য কিন্তু রক্ত। মানুষ, গরু ইত্যাদি প্রাণীর দেহের সঙ্গে লেগে থেকে এরা রক্ত চুষে খায়। আবার পোকামাকড় কিভাবে পাতা, ফল ইত্যাদি কুরে কুরে খায় নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো। এই খাদ্যের পার্থক্যের জন্যে তাদের মুখের গঠনের পরিবর্তন সত্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আবার চিন্তা করো তোমার ছেলেবেলার কথা। যখন তুমি খুবই বাচ্চা, কিছু শক্ত খাবার খেতে পার না তখন মায়ের বুকের দুধ খেয়েই তুমি বেঁচে ছিলে। এমনি মায়ের দুধ খেয়ে ছোট বেলায় বেঁচে থাকে গরু, কুকুর, বিড়াল, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণীরা। কিন্তু মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পাখী এদের কখনও মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচে না। কারণ ওদের মায়ের সেরূপ কোন দুধের ব্যবস্থা
মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচে না। কারণ ওদের মায়ের সেরূপ কোন দুধের ব্যবস্থা
থাকে না। তাই আমরা বা আমাদের মত মায়ের দুধ খেয়ে যারা বড় হয় তারা যে এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত জীব এ সিদ্ধান্ত তুমি অতি সহজেই নিতে পার। এবং যখনই দেখবে কোন প্রাণীর বাচ্চা তার মায়ের দুধ খাচ্ছে তখনই তাকে সেই একই শ্রেণীভুক্ত প্রাণী বলে মেনে নেবে।

চলন পদ্ধতি ঃ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো অধিকাংশ প্রাণী এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে বেড়াচ্ছে। এদের চলাফেরা করার পদ্ধতি কিন্তু দেখবার মত। তুমি দুপায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছো। কিন্তু তোমার আশপাশে গরু, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি যে সব প্রাণী রয়েছে তারা চারপায়ে ভর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ব্যাঙ পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে; কিন্ত সাপ বুকে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টিকটিকির প্রত্যের পায়ের আঙুলগুলো লক্ষ্য করলেই দেখবে মাথাটা মোটা এবং এই জায়গায় নিচে সমান্তরালভাবে ছোট ছোট অবতল অংশ সাজান। তাই টিকটিকি সহজেই দেওয়ালে দেওয়ালে [illegible] বেড়ায়। এদিকে আর [illegible] সাঁতার কাটছে, পাখী হাল্কা ডানায় আকাশে বিচরণ করছে। এ থেকে নিশ্চয় বুঝলে যে অধিকাংশ প্রাণীই চলাফেরা করতে পারে। খাদ্য যোগাড় করার জন্যে তাদের চলাফেরা করা বিশেষ প্রয়োজন। তবে তাদের চলাফেরার প্রকারভেদ রয়েছে।

এই প্রকারভেদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাদের পারিপার্শ্বিক ও আকারগত প্রভেদ।

অমেরুদণ্ডীর চলাফেরাও লক্ষ্য করার মত। কেঁচো চলার সময় সারা দেহে একটা ঢেউ খেলিয়ে চলে। জোঁকের চলার ভঙ্গি (চিত্র ৩৬ দেখ) বেশ দেখার মত। জোঁকের সামনে ও পিছনে গোলাকার চাকৃতির মত মাংস আছে। এদের সাহায্যেই এই রকম গতি সম্ভব হয়। অসংখ্য পা-বিশিষ্ট কেন্নোর

চিত্র ৩৫ ঃ জলে মাছ স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটছে

চলার গতি লক্ষ্য করলে দেখবে কেমন ঢেউ তুলে পা-গুলো নড়াচ্ছে আর কেন্নোটি এগিয়ে যাচ্ছে। শামুক যখন মাটির উপর দিয়ে চলে তখন তার দেহ থেকে একরকম রস বেরিয়ে পথটাকে পিচ্ছিল করে দেয়। তাই শামুককে স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে যেতে দেখা যায়।

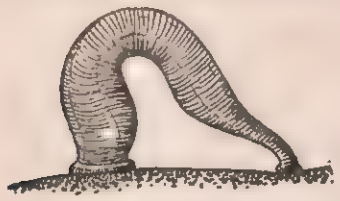

চিত্র ৩৬ ঃ জোঁকের চলন

এবার উদ্ভিদের দিকে তাকাও। যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন দেখবে গাছের এক অংশ সূর্যের দিকে ঘুরে বেড়ে চলেছে (চিত্র ৩ দেখ) আর অন্য

এক অংশ মাটির মধ্যে ঢুকছে। যে অংশ উপরে থাকে তাকে সাধারণতঃ কাণ্ড বলে চিনতে পারবে। আর মাটির মধ্যে যে অংশ চলে গেল সেটা শিকড়।

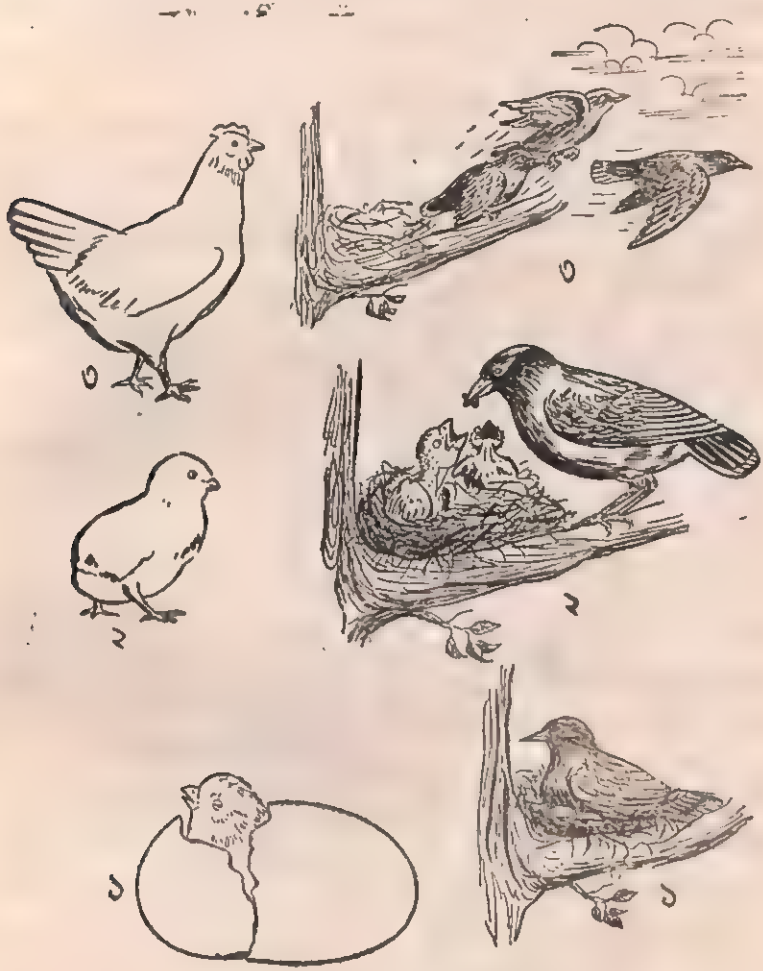

চিত্র ৩৭ ঃ মুরগী ও পাখীর বৃদ্ধি

তাহলে দেখলে, শিখলে যে গাছের কাণ্ডের চলার গতি সূর্যের দিকে। তেমনি মূল বা শিকড়ের গতি মাটির দিকে বা জলের দিকে। এইবার তুমি এই **সিদ্ধান্ত নিতে পার যে, যদিও অধিকাংশ গাছকে প্রাণীর মত চলাফেরা করতে**

দেখা যায় না, তবুও গাছের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নাড়াচাড়া করবার ক্ষমতা আছে। প্রয়োজনে সেই অঙ্গ বিভিন্ন দিকে চালিত হয়।

এইবার নিশ্চয় তুমি একথা বলতে পার যে, **প্রতিটি জীবেরই চলাফেরা অথবা অঙ্গ নাড়াচাড়া করবার ক্ষমতা আছে।** এবং জীবের এটা একটা বিশেষ ধর্ম।

বৃদ্ধি ঃ তোমার বাগানে কয়েকটি বীজ পুঁতে দিলে। কয়েক দিন নিয়মিত জল দেবার পর দেখবে তা থেকে ছোট ছোট চারা গাছ বের হয়েছে। এইবার ঐ গাছগুলোর গোড়ায় ঠিকমত জল ও সার দাও। দেখ আস্তে আস্তে সেগুলো কেমন বড় হয়ে উঠছে। দিনে দিনে বড় হয়ে ক্রমশঃ সেগুলো নির্দিষ্ট উদ্ভিদের আকার ধারণ করবে।

তোমার ঘরের কড়ি বরগার ফাঁকে অথবা গাছের ডালে পাখীর বাসা নিশ্চয় খুঁজে পাবে। লক্ষ্য করে দেখ, ওই বাসার মধ্যে বেশ কয়েকটি ডিম রয়েছে। আর পাখী বসে তাতে তা দিচ্ছে। বেশ কয়েকদিন ধরে নজর রাখ। একদিন দেখবে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়েছে; আর মা পাখী মুখে করে খাবার এনে সেই বাচ্চাগুলোকে খাওয়াচ্ছে। আরও কয়েকদিন পরে দেখবে বাচ্চাগুলো ফুর ফুর করে বাসা থেকে বের হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। মুরগীরও একইভাবে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। এবার তোমার বাড়ির প্রিয় কুকুর বাচ্চাগুলোর দিকে তাকাও। কেমন ছোট ছোট বাচ্চা খেলা করে বেড়াচ্ছে, মায়ের দুধ খাচ্ছে। দিনে দিনে দেখবে তারা বড় হয়ে উঠছে। তোমার দেওয়া খাবারও খাচ্ছে। তারপর একদিন তারা তাদের মায়ের মত বড় কুকুরে পরিণত হবে। এ থেকে নিশ্চয় তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, **প্রতিটি জীবেরই বৃদ্ধি আছে। ঠিকমত খাদ্য পেলে প্রতিটি জীবই বৃদ্ধি পেয়ে পরিণত হয়ে ওঠে।**

উত্তেজিত্ব ঃ বাবা যখন পড়া না করার জন্য তোমার কানটি মলে দেন নিশ্চয় তুমি ব্যথা পাও। বোনটি যখন দুষ্টুমি করে তোমার গায়ে চিমটি কাটে, যন্ত্রণায় নিশ্চয়ই তুমি চেঁচিয়ে ওঠ। আগুনের স্পর্শ মাত্রই তুমি হাত সরিয়ে নাও। মশার কামড়ে অস্থির হয়ে নিশ্চয় তুমি মশারির মধ্যে যাও। আবার ভীষণ শীতে তোমার সারা গা কেঁপে ওঠে। কিন্তু কেন বলো তো? কারণ তোমার অনুভূতি আছে। তোমার মত এই অনুভূতি শক্তি প্রতিটি জীবেরই আছে। একটি কেঁচো যখন তোমার কাছ দিয়ে মাটির উপর চলছে তুমি হাত বা একটা পেনসিল দিয়ে তার দেহ স্পর্শ করো। দেখবে সঙ্গে সঙ্গে কেঁচোটি গুটিয়ে যাবে। আবার চলমান শামুকের গায়ে পেনসিলের খোঁচা দাও। সঙ্গে সঙ্গে শামুকটি তার খোলকের মধ্যে ঢুকে যাবে। তোমার পোষা কুকুরটিকে

একটি চাবুক দিয়ে আঘাত কর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় সে ডাকতে থাকবে। এইসব দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারলে **প্রতিটি প্রাণীরই অনুভূতি শক্তি** আছে। আবার একটি লজ্জাবতী লতার পাতায় আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করো। দেখবে পাতাটি কেমন নুয়ে পড়বে। এই গাছের অন্য পাতাগুলিকে স্পর্শ করলে

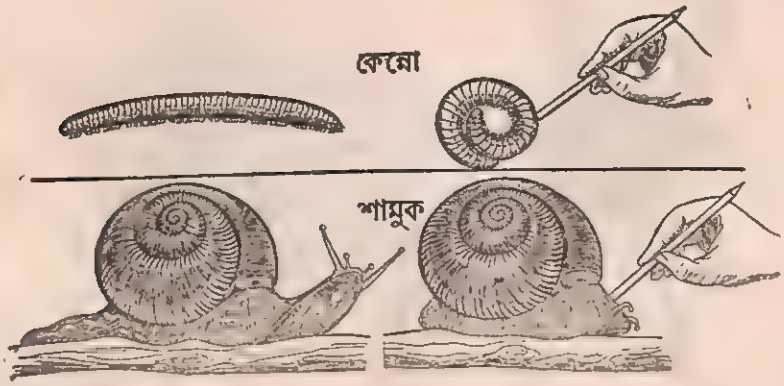

চিত্র ৩৮ ঃ প্রাণী উত্তেজনায় সাড়া দিচ্ছে

ঠিক একই অবস্থা হবে। এ থেকে উদ্ভিদেরও যে অনুভূতি আছে তা বুঝতে তোমার দেরী হয় না। এখন তুমি সিদ্ধান্তে এলে যে **জীব মাত্রেই অনুভূতি-প্রবণ**, উত্তেজিত হলে সে সাড়া দেয়।

বংশবৃদ্ধি ঃ তোমার বাগানে অনেক গাছের তলায় সেই গাছেরই ছোট ছোট চারাগাছ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো। কিন্তু এগুলো এলো কোথা থেকে? লক্ষ্য করলে দেখবে পরিণত গাছে কোন না কোন সময় ফুল হয়। ফুল থেকে হয় ফল। ফলের মধ্যে বীজ থাকে। সেই বীজ যদি মাটিতে পড়ে আর মাটি যদি উর্বর হয় তবে সেই গাছকে ঘিরে প্রচুর চারাগাছ দেখা যাবে। পাখীর মুখে লেগে, অন্য কোন প্রাণীর দেহে লেগে অথবা অন্য অনেক উপায়ে এই বীজ অনেক দূরেও চলে যেতে পারে। যেখানেই যাক্ উপযুক্ত পরিবেশে বীজ থেকে চারাগাছ হবে। সেই গাছ আবার বড় হয়ে এইভাবেই চারাগাছ তৈরী করে যাবে।

এদিকে প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখ বংশবৃদ্ধি ঘটে। একটি ইঁদুর বাচ্চা ছিল। সেই ইঁদুর বড় হল, তারও বাচ্চা দেওয়ার সময় হল, সেও বাচ্চা দিল।

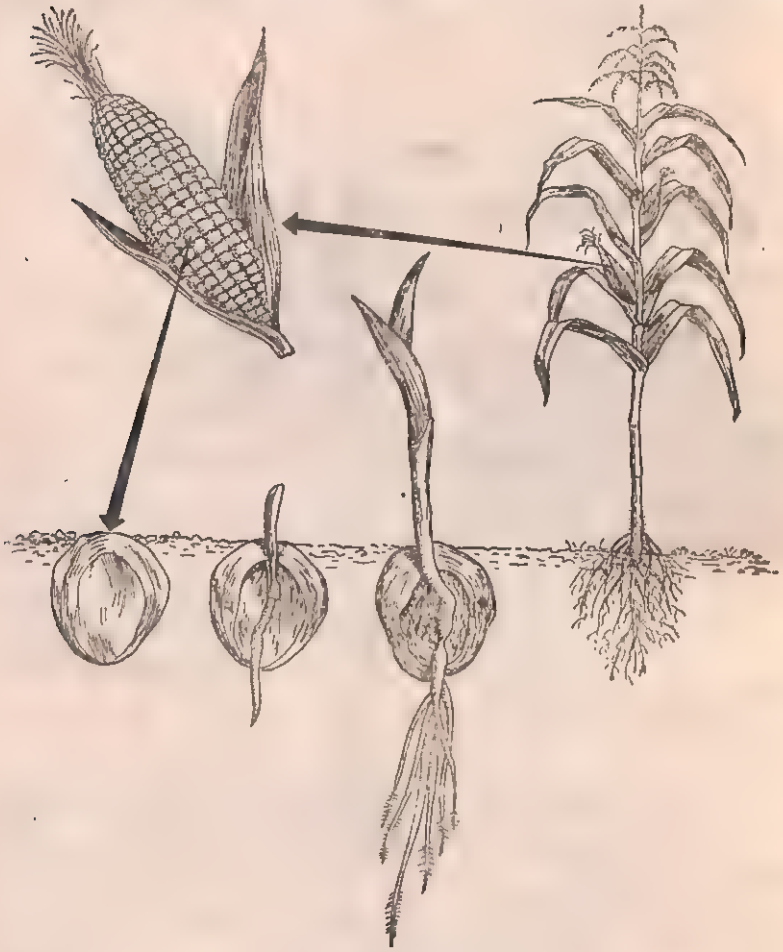

চিত্র ৩৯ : গাছের বংশবৃদ্ধি

এইভাবে একটি ইঁদুর থেকে অসংখ্য ইঁদুরের সৃষ্টি হল। মাছ ডিম পাড়ে। তা থেকে একইভাবে অসংখ্য মাছ জন্মায়।

প্রতিটি গাছ ও প্রতিটি প্রাণী তাদের নিজেদের সংখ্যা এইভাবে বাড়িয়ে

চলেছে। জীবের এই বৈশিষ্ট্যকে বলে বংশবৃদ্ধি। একটু লক্ষ্য রাখলেই তা তুমি দেখতে পাবে।

এইভাবে জীবকে পর্যবেক্ষণ করে তোমার যে শিক্ষা হল তা থেকে এই সিদ্ধান্ত নিতে পার যে জীব মাত্রেই বংশবৃদ্ধি করে।

মৃত্যু ঃ তোমার বাগানের যে কোন একটি গাছের দিকে লক্ষ্য রাখলেই

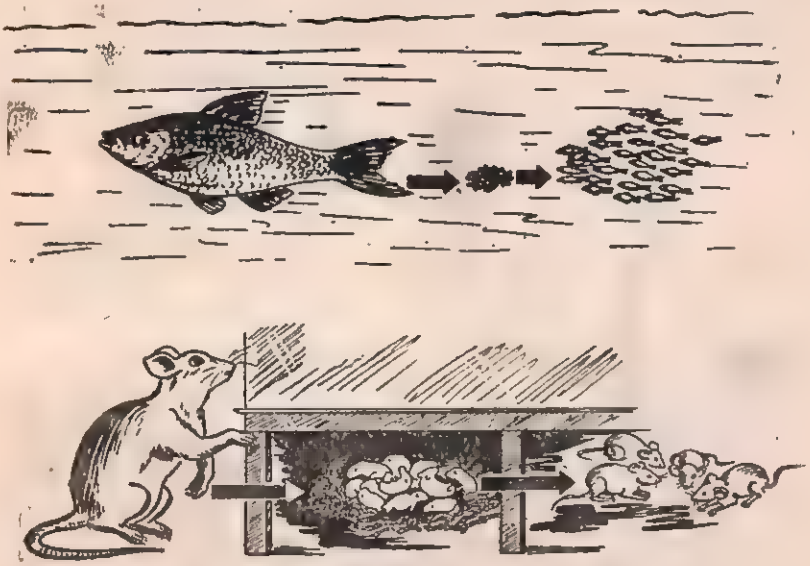

চিত্র ৪০ ঃ মাছ ও ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি

দেখবে সেই গাছ বড় হবে, তার ফুল হবে, ফল হবে। বেশ কিছুদিন পর সেই গাছের পাতাগুলো ঝরে যাবে, তার কাণ্ড শুকিয়ে যাবে, গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। যে কোন প্রাণীর ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই একইরূপ ঘটনা ঘটে। তোমার প্রিয় ছোট্ট মেনি বিড়ালটি বড় হবে, হয়ত কয়েকটি বাচ্চাও দেবে। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হয়ে একদিন মরে যাবে। তোমার আমার দশাও কিন্তু ওই এক রকমেই হবে। এটা তোমার পরিবেশের বিভিন্ন জীবের জীবনধারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে। **তাই তুমি সিদ্ধান্তে আসতে পার যে জন্মালে মরতেই হবে। মৃত্যুর হাত থেকে কারো পরিত্রাণ নাই।**

শুনে শেখা

বাবা যখন বাইরে থেকে নাম ধরে ডাকেন তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তাঁর গলার স্বরে চিনতে পার। তেমনি তোমার বাড়ির অথবা তোমার পরিচিত প্রায় সকলের ডাক শুনে, অর্থাৎ কথা শুনে তুমি সহজেই তাঁদের চিনতে পার। বিভিন্ন ব্যক্তির গলার স্বরের বিভিন্নতাই এর কারণ। আবার তোমার বাড়ির গরুটি যখন হাম্বা হাম্বা করে ডাকে, কুকুরটি যখন ঘেউ ঘেউ করে, বিড়াল মিউ মিউ করে, আর পাখী দাঁড়ে বসে সুমিষ্ট স্বরে গান করে তখন ওই স্বর শুনেই তুমি বুঝতে পার তোমার গরু, কুকুর, বিড়াল বা পাখী কোন্‌টি ডাকছে। তাহলে একথা নিশ্চয় স্বীকার করবে যে, যেসব প্রাণীর শব্দ করবার ক্ষমতা আছে তাদের গলার আওয়াজ বিভিন্ন এবং চোখে না দেখেও ওই স্বর শুনেই তাদের চিনতে পারা যায়। তাই অন্ধকারেও ঝিঁ ঝিঁর শব্দে ঝিঁ ঝিঁ পোকার উপস্থিতি টের পাও। ক্যাঁকর ক্যাঁক ডাক শুনে বুঝতে পার ব্যাঙ ডাকছে। আবার বিভিন্ন পাখীর ডাকের সঙ্গে পরিচয় থাকলে বাগানের পারবে কোকিল এসেছে। চড়ুইয়ের মিষ্টি কুহু ডাক শুনেই তুমি বুঝতে কিচির মিচির শব্দেই বুঝতে পারবে ঘরে চড়ুই ঢুকেছে। বাইরের কা-কা শব্দেই জানতে পারবে কাক উড়ে বেড়াচ্ছে। তাই স্বর শুনে কোন্ শ্রেণীর প্রাণী যেমন চেনা যায়, তেমনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলে সেই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর মধ্যেও প্রভেদ করা যায়।

চিত্র ৪১

বহু প্রাণীর শ্রবণ ইন্দ্রিয় খুব প্রখর। চোখে না দেখেও শুধু কানে শুনে তারা অন্যের উপস্থিতি বুঝতে পারে। বাদুড় যখন বনের মধ্যে দিয়ে রাতের অন্ধকারে উড়ে চলে তখন সে দেখতে পায় না। তাই সে মুখ দিয়ে একরকম

আওয়াজ করে। ঐ আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে না এলেই সে বোঝে তার পথ পরিষ্কার। কিন্তু ওই আওয়াজের প্রতিধ্বনি পেলেই বাদুড় সতর্ক হয়ে যায়। কারণ বুঝতে পারে সামনেই কোন বড় গাছপালা বা অন্য কোন বাধা রয়েছে। সেজন্যেই তার স্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে।

আমরা যদি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুলি তবে বিভিন্ন প্রাণীকে চিনতে ও তাদের আচার-ব্যবহার জানতে আমাদের একটুও দেরী হবে না। উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত হতে পারে যে, বিভিন্ন রকম স্বরের মধ্যে দিয়েই প্রাণীরা তাদের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে।

শরীরের স্পর্শ দিয়ে শেখা

কানামাছি খেলবার সময় তোমার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় বন্ধুদের খুঁজে নিতে হাত বাড়িয়ে তুমি এগিয়ে চলো। কোন কিছুতে হাত লাগলেই তুমি তার গায়ে ভাল করে হাত বুলিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর সেটা কি। কেন এমন করো? তার কারণ তোমার একটি ইন্দ্রিয় হচ্ছে দেহের ত্বক। এই ত্বকের মাধ্যমে যে অনুভূতি জাগে তাতেই তুমি বুঝতে পার কোন্ জীব বা জড়ের নিকটে তুমি এসেছো। অধ্যবসায় দ্বারা এই স্পর্শেন্দ্রিয় সজাগ করে তুললে সামান্য স্পর্শের মধ্য দিয়েই তুমি অনেক কিছুই জানতে পারবে। অন্ধ ব্যক্তির এই ইন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর। তাই স্পর্শের মাধ্যমেই তারা অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পাচ্ছে।

চিত্র ৪২

তোমার হাতে একটা মশা ও একটা মাছি বসলো। দেহকে স্পর্শ করা

মাত্রই তুমি তাদের উপস্থিতি জানতে পারলে। কিছুক্ষণ পরে তুমি অনুভব করলে যেখানে মশাটি বসে আছে সে জায়গাটি চুলকোচ্ছে। তক্ষুণি চমি বুঝলে যে মশা কামড়ায়, অর্থাৎ হুল ফুটায় কিন্তু মাছি কামড়ায় না। পরে চোখে না দেখেও শুধু ত্বকের স্পর্শ অনুভূতির মধ্য দিয়ে তুমি মাছি বা মশার উপস্থিতি বুঝতে পারবে। বাজার থেকে মাছ, আলু, বেগুন, মূলো, এসেছে। চোখ বুজে হাত বুলিয়ে তাদের গঠন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করলে পরে ওগুলো না দেখেই শুধু স্পর্শের দ্বারাই ওদের চিনতে পারবে। এথেকে **সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, শুধু স্পর্শ করেই বিভিন্ন জীবকে চেনা যায়।**

শুঁকে শেখা

তুমি একমনে কাজ করে চলেছো। হঠাৎ এক বিশেষ গন্ধ তোমার নাকে এলো। না দেখেই তুমি বুঝতে পারলে যে বাড়ির পোষা কুকুরটি পাশে এসেছে। প্রতি জীবেরই নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। সেই গন্ধের সঙ্গে আগে ভাগে পরিচয় থাকলে গন্ধই তাকে চিনিয়ে দেবে। পিঁপড়ে, আরশোলা, ছারপোকা, ইলিশ মাছ, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর আলাদা গন্ধ আছে। এদের বিশেষ বিশেষ গন্ধের সঙ্গে পরিচয় থাকলে না দেখে কেবল গন্ধ শুঁকেই প্রাণীগুলোকে চেনা যায়। গোলাপ, হাসনাহানা, বেল, জুঁই ইত্যাদি ফুলের গন্ধের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। এদের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এক সময় এমনই শিক্ষিত হয়ে উঠবে যে না দেখে কেবল গন্ধ শুঁকেই তাকে চিনে ফেলবে। বিভিন্ন গাছের পাতার ও কাণ্ডের গন্ধও বিভিন্ন। তাই গন্ধ শুঁকে গাছ চেনা সহজ। গ্যাঁদাল, তুলসী, গাঁদা ইত্যাদি গাছের বিশেষ

চিত্র ৪৩

গন্ধেই তাদের চিনবে। আম, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি ফলের গন্ধ শুঁকে তাদের চেনা যায়।

বিভিন্ন মানুষের গায়ের গন্ধও বিভিন্ন। এই গন্ধের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় থাকলেই তবে চেনা সম্ভব। কুকুরের এই ঘ্রাণশক্তি, অর্থাৎ শুঁকে চেনার শক্তি অত্যন্ত প্রবল। কোন লোকের ব্যবহার করা জামা-কাপড় শুঁকে সে তাকে চিনে নিতে পারে এবং অন্য লোকের মধ্যে থেকে তাকে বেছে বার করতে সক্ষম হয়। কুকুরের এই ক্ষমতার জন্যে চোর ধরতে কুকুরের সাহায্য নেওয়া হয়।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে অধিকাংশ জীবেরই নিজস্ব গন্ধ আছে।

জিবের স্বাদে শেখা

নিম, তেঁতুল গাছ তোমরা অনেকেই চেনো। তেঁতুলের পাতা মুখে নিয়ে চিবিয়ে তার স্বাদ নাও। দেখ কেমন টক্ টক্ স্বাদ পাচ্ছ। কিন্তু নিমের পাতা চিবোলেই মুখ তেতো হয়ে যাবে। ঐ দুটো গাছের পাতার স্বাদের বিভিন্নতা তোমার জানা হয়ে গেল। এখন ঐ স্বাদ গন্ধই তোমাকে গাছ চিনতে সাহায্য করবে। কলা, আপেল, লেবু, বেদানা প্রভৃতি ফলের স্বাদ তোমার জানা। তাই অন্ধকারে বসে থেলেও তাদের স্বাদে টের পাও কি ফল খাচ্ছ। টক, মিষ্টি, কষা ইত্যাদি স্বাদের মাধ্যমেই উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হলে উদ্ভিদকে সহযেই চিনতে পারবে।

চিত্র ৪৪

খাবার সময় পাতে যে মাছটি পেলে সেটা কি মাছ জিজ্ঞাসা করলে তুমি কি বলতে পারবে? হয়ত যখন মাছটি বাজার থেকে আনা হয়েছিলো তখন তুমি পড়াশুনা করছিলে। তাই তার আকার দেখে মাছটিকে চিনে রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্ত এখন স্বাদে কি ঐ মাছ চেনা যাবে? হ্যাঁ। কারণ বিভিন্ন মাছের স্বাদ বিভিন্ন। তাই মাছটি ইলিশ, কি রুই, কি

ঠিক, কি কই মুখে দিলে স্বাদের সাহায্যেই বলতে পারবে। বিভিন্ন মাছের স্বাদের সঙ্গে আগে থেকে পরিচিত বলেই তোমার পক্ষে বলাটা সহজ হল। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে স্বাদেরও বিভিন্নতা আছে।

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের নাম লেখ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও যে শিক্ষালাভ করা যায় আলোচনা করিয়া দেখাও।

২। "বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে জীবজগতের বৈচিত্র্য অতুলনীয়"—এই উক্তির সমর্থনে তোমার বক্তব্য রাখ।

৩। বহিরাকৃতি ও বর্ণগত পার্থক্য অনুশীলন করিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ।

৪। সকল প্রাণীর খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতিই কি এক? প্রাণীর খাদ্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।

৫। "প্রাণীর চলাফেরার পদ্ধতি দেখবার মত"—এই উক্তির কোন যুক্তি আছে কি? প্রাণীর চলাফেরার পদ্ধতি কেনই বা দেখবার মত তাহা উদাহরণ দিয়া আলোচনা কর।

৬। তোমার বাগানে একটি উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম হইতে শুরু করিয়া সকল পর্যায়ের বৃদ্ধি এবং একটি কুকুর বাচ্চার পরিণত হওয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া তুমি সাধারণভাবে কি সিদ্ধান্তে আসিতে পার সংক্ষেপে বল।

৭। "মৃত্যুই জীবনের পরিণতি"—এই উক্তির কোন যুক্তি আছে কি? আলোচনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

[Objective Test]

Yes or No Type.

৮। প্রশ্নের পাশে 'হাঁ' বা 'না' লিখিয়া উত্তর দাও:

(ক) সন্ধ্যাবেলা ঝি ঝি ডাক শুনিয়া জীবটি উদ্ভিদ না প্রাণী চিনিতে পার কি?

(খ) ঝিঙ্গে, উচ্ছে, লাউ প্রভৃতি উদ্ভিদের কি সবল কাণ্ড আছে?

(গ) কেঁচো ও কৃমি কি একই জাতের প্রাণী?

(ঘ) মেয়ে পাখী ও পুরুষ পাখীকে রং দেখে চেনা যায় কি?

(ঙ) সকল প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতিই কি এক?

৯। এককথায় উত্তর দাও :

(ক) সাপ কিভাবে ঘুরে বেড়ায় ?
(খ) ব্যাঙ কিভাবে খাদ্য ধরে ?
(গ) পাখী কিসের সাহায্যে আকাশে উড়ে ?
(ঘ) কেন্নোর গায়ে হাত দিলে কি হয় ?
(ঙ) লজ্জাবতী লতায় হাত ছোঁয়ালে কি দেখা যায় ?

১০। শুদ্ধ করিয়া লেখ :

(ক) মানুষ গন্ধ শুঁকে অপরাধীকে ধরতে পারে।
(খ টিকটিকর গায়ে হাত দিলে তারা হাত পা গুটিয়ে যায়।
(গ) ব্যাঙ পা দিয়ে পতঙ্গ ধরে।
(ঘ) বিড়াল ঘেউ ঘেউ করে ডাকে।
(ঙ) বাদুড় দেখে দেখে রাত্রে উড়ে চলে।
(চ) হাতে নিলেই কোন্‌টা মিষ্টি, কোন্‌টা টক আর কোন্‌টা ঝাল টের পাওয়া যায়।

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) — মিল ও — উপর নির্ভর করে জীবকুলকে বিভিন্ন — ভাব কর — ধর্ম।
(খ) বুলবুলির — থাকে — ঝুঁটি। এদের চোখের — যে ছোট ছোট — আছে সেগুলো কিন্তু —।
(গ) মাছরাঙ্গার দেহের রং —। তবে এর ডানায় — আভা আছে।
(ঘ) খরগোস — চলে, সাপ — চলে, মাছ — চলে এবং মানুষ — চলে।
(ঙ) গাছকে প্রাণীর মত — করতে দেখা যায় না তবুও গাছের — — অংশের — করবার ক্ষমতা আছে।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Deptt of Extension Services.
CALCUTTA-27

৪ সহজ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবকে পর্যবেক্ষণ
[Observation of living objects through simple experiments]

তুমি জানো, জলে, স্থলে, বাতাসে সর্বত্রই জীব রয়েছে। তাদের বৈচিত্র্যের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছো। কিন্তু যত বৈচিত্র্যই থাকুক, সব জীবের জীবনী-শক্তির মূল বা উৎস হল একপ্রকার জৈব পদার্থ। এর নাম প্রোটোপ্লাজম তা তোমরা জান। সব জীবের প্রোটোপ্লাজম একই পদার্থ। জেলির মত দেখতে এই পদার্থে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরস পাওয়া যায়। তবে ঐ অনুপাতে এইসব মৌল উপাদানগুলিকে মিলিয়ে ল্যাবরেটরীতে জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। সে জন্যে জীবনের আসল রহস্য এখনও জানা যায়নি। তবে একথা ঠিক যে, এই প্রোটোপ্লাজমই জীবনের সার পদার্থ। যেখানে জীবন সেখানেই এই জৈব পদার্থটি রয়েছে। তাই বেঁচে থাকা মানেই এই জৈব পদার্থকে বাঁচিয়ে রাখা। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই **আলো, বাতাস** (অক্সিজেন), **জল** ও **খাদ্য**। বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনধারণের জন্যে এগুলি কেন অপরিহার্য তা দেখান হল।

আলোর প্রয়োজনীয়তা ঃ আলোর প্রধান উৎস সূর্য। সূর্যালোক না থাকলে জীবের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যেত। কারণ তোমরা আগেই দেখেছো উদ্ভিদ শর্করাজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে কেবল সূর্যালোকে। তাই সূর্য ছাড়া উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না। আবার উদ্ভিদ ছাড়া প্রাণী বাঁচে না। সহজ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখান যায় যে আলো ছাড়া উদ্ভিদ বাঁচে না।

আলোর প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা

প্রথম পরীক্ষা ঃ তোমার বাগানে নিশ্চয় টবে লাগানো গাছ আছে। একই রকমের গাছ লাগানো দুটি টব বেছে নাও। প্রতি টবের মাটিতে প্রয়োজনীয়

সার ও জল দাও। লক্ষ্য কর টব দুটির গাছ একইভাবে বাড়ে কিনা। এইবার একটি টবকে ওখানেই রাখ। আর অন্য টবটি কাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। এখন দুটি টবেই নিয়মিত জল দাও এবং টবের গাছ দুটির বৃদ্ধি লক্ষ্য কর।

চিত্র ৪৫ ঃ গাছের আলোর প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা

নিরীক্ষণ ঃ কয়েকদিন পর দেখবে যে-টবটিতে সূর্যের আলো ঠিকমত আসছে সেই টবের গাছ বেশ সতেজ রয়েছে। গাছটি স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু অন্য টবের গাছটি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কাল কাপড়ে ঢাকা টবের গাছটি আলো ছাড়া প্রয়োজনীয় সব কিছু উপাদান পেয়েছিল, তথাপি শুকিয়ে গেল। তাই বলা যায় আলো ছাড়া উদ্ভিদ বাঁচে না।

দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ টবশুদ্ধ একটি গাছকে কাল কাপড়ে ঢেকে রাখ, পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই এই গাছের একটা পাতার মাঝের অংশ কাল কাগজ দিয়ে ঢেকে দাও। এইবার টবটিকে বাইরে আলোয় বের কর। কয়েক ঘণ্টা পর কাল কাগজ ঢাকা সেই পাতাটি ছিঁড়ে নাও। কাল কাগজ সরিয়ে পাতাটি

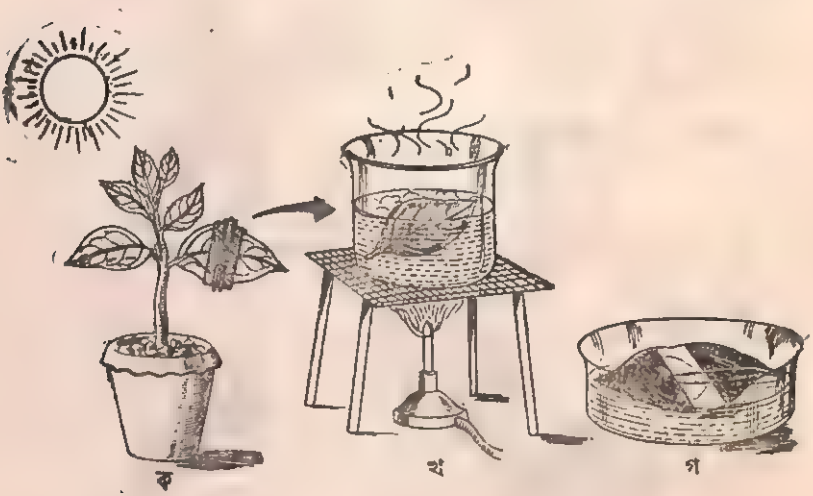

চিত্র ৪৬ ঃ আলো ছাড়া গাছের যে খাদ্য তৈরী হয় না তার পরীক্ষা

ক—কাল কাপড়ে ঢেকে রাখা টবটাই আলোয় আনা হয়েছে।
খ—ঢাকা পাতাটি ছিঁড়ে কোহলে ফুটিয়ে ক্লোরোফিল তাড়ন হচ্ছে।
গ—ঢাকা অংশে (সাদা) শ্বেতসার হয়নি।

গরম কোহলের মধ্যে ফুটিয়ে নাও। যখন দেখবে পাতাটি রংহীন হয়েছে তখন তুলে নিয়ে সেটিকে পাতলা আয়োডিন দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে দাও।

নিরীক্ষণ ঃ দেখবে যে পাতার ঢাকা অংশটা ছাড়া সমস্ত পাতাটায় নীল রং ধরেছে।

সিদ্ধান্ত : শ্বেতসার বা শর্করাজাতীয় পদার্থ আয়োডিনের স্পর্শে নীল রং ধারণ করে। তাই বোঝা গেল, পাতার যে অংশ আলোতে ছিল সেখানে শ্বেতসার উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু যে অংশ আলো পায়নি সেখানে শ্বেতসার হয়নি। আলো ছাড়া গাছের পাতা শর্করা তৈরী করতে পারে না। অতএব আলো গাছের পক্ষে অপরিহার্য।

তৃতীয় পরীক্ষা : একটা বড় টিনের টুকরো যোগাড় কর। সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠটার কিছুটা অংশ টিনটা দিয়ে ঢাকা দাও।

নিরীক্ষণ : কয়েকদিন বাদে টিনটা ওঠালে দেখবে ঘাসগুলো সরু লম্বা হয়ে গেছে। তাদের রংও হালকা হলুদ হয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত : আলো না পেলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে না।

প্রাণীর ক্ষেত্রে আলোর প্রয়োজনীয়তা

অধিকাংশ প্রাণীর দেহে সবুজকণা, অর্থাৎ ক্লোরোফিল নাই, তাই সূর্যালোক পেলেও প্রাণী শর্করা তৈরী করতে পারে না। তবে যে সমস্ত প্রাণী ক্লোরোফিলের অধিকারী তাহা গাছের মতই শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরী করে। ইউগ্লিনা সেই জাতীয় প্রাণী। ক্লোরোফিলবিহীন প্রাণীর খাদ্য প্রস্তুতের জন আলোর প্রয়োজন না হলেও তার জীবনধারণের জন্য আলো চাই। কারণ খাদ্যের জন্য তাদের ছুটাছুটি করতে হয়, বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে হয়। স্থানান্তরে যেতে তাকে নির্ভর করতে হয় দৃষ্টিশক্তির উপর। অধিকাংশ প্রাণীই কেবল আলোতেই দেখতে পায়, অন্ধকারে পায় না। রাতের অন্ধকারে তারা অসহায় হয়ে পড়ে। আবার দিনের আলোয় তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে বের হতে হয়। তাই প্রাণীরও আলোর একান্ত দরকার।

মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। তাই প্রকৃতির আলো ছাড়াও কৃত্রিম আলো সৃষ্টি করে অন্ধকারেও কাজ চালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কেরোসিনের আলো, মোমের আলো, টর্চের আলো মানুষই সৃষ্টি করেছে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে। রাতের অন্ধকারে এইসব আলো না পেলে মানুষের কি অসহায় অবস্থা হয় তুমি নিজেই সেটা পরীক্ষা কর।

চতুর্থ পরীক্ষা : সূর্য ডুবে গেছে। চারিদিক গাঢ় অন্ধকার। এখনও তোমার বাড়ীতে রাতের খাবার তৈরী হয়নি। ঠিক এমন সময় সমস্ত বিদ্যুৎ-

এর আলো নিভে গেল অথবা যে হ্যারিকেনটি জ্বলছিল তাও ভেঙে গেল। তোমার বাড়ীতে কেরোসিন, মোম, টর্চ এমনকি একটা দেশলাই পর্যন্ত নাই। তোমার ও তোমার বাড়ীর লোকের সে সময়ের কথা চিন্তা কর।

নিরীক্ষণ ঃ অসহায় হয়ে ছুটাছুটি করতে গিয়ে তোমরা ঠোকাঠুকি খেলে। কারুর হয়ত পড়ে হাত-পা জখম হল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হয়ত কোন রকমে ঘরে এসে ঢুকলে, কিন্তু কিছুই খাবার তৈরী করা গেল না। অসহায়-ভাবে সারারাত উপবাস করে কাটাতে হলো। পরের দিন সূর্যোদয়ে আবার তোমাদের কর্মক্ষমতা ফিরে এল।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রাণীর জীবন আলোর সঙ্গে জড়িত।

মন্তব্য ঃ আমাদের খাদ্য হয় উদ্ভিদ না হয় অন্য প্রাণী, না হয় উভয়েই। আবার যে প্রাণী আমাদের খাদ্য তাদের খাদ্যও উদ্ভিদ। আলো ছাড়া যদি উদ্ভিদজগৎ না বাঁচে তবে খাদ্যের অভাবে আমাদেরও বাঁচা সম্ভব নয়। তাই উদ্ভিদ, প্রাণী, এমনকি মানুষেরও বাঁচার জন্য আলোর প্রয়োজন।

আলোর অন্য প্রয়োজনীয়তা

প্রকৃতির উষ্ণতা সৃষ্টির উৎস কিন্তু আলো। যে কোন উষ্ণতায় সমস্ত জীব বাঁচতে পারে না। আলোকশক্তির কমবেশীতে উষ্ণতার পরিবর্তন হয় এবং জীবকুলের উপর তার যে প্রতিক্রিয়া হয় তাও পরীক্ষা করে দেখান যায়।

পঞ্চম পরীক্ষা ঃ তিনটি পাত্র নাও। প্রতি পাত্রে কিছু জল দিয়ে ছোলা ভিজিয়ে দাও। প্রথম পাত্রটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উষ্ণতায় রেখে দাও। দ্বিতীয় পাত্রের জলে খানিকটা করে বরফ মাঝে মাঝে দিতে থাক। তৃতীয় পাত্রের জলে মাঝে মাঝে কেটলি থেকে গরম জল ঢেলে দাও।

নিরীক্ষণ ঃ দেখা যাবে প্রথম পাত্রের ছোলাগুলি অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্রের ছোলার কোন পরিবর্তন হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ অঙ্কুরোদ্গমের জন্য নির্দিষ্ট উষ্ণতার প্রয়োজন।

ষষ্ঠ পরীক্ষা ঃ দুইটি ব্যাঙ ধর। একটি ব্যাঙকে জারের মধ্যে নিয়ে ঘরের সাধারণ উষ্ণতায় রাখ। অন্য ব্যাঙটি জারে করে একটা ঠাণ্ডা ঘরে রাখ। ওই ঠাণ্ডাঘরের উষ্ণতা বাইরের উষ্ণতার চেয়ে যেন অনেক কম হয়।

নিরীক্ষণ ঃ ঘরের সাধারণ উষ্ণতায় রাখা ব্যাঙটিকে জারের মধ্যে বেশ লাফা-

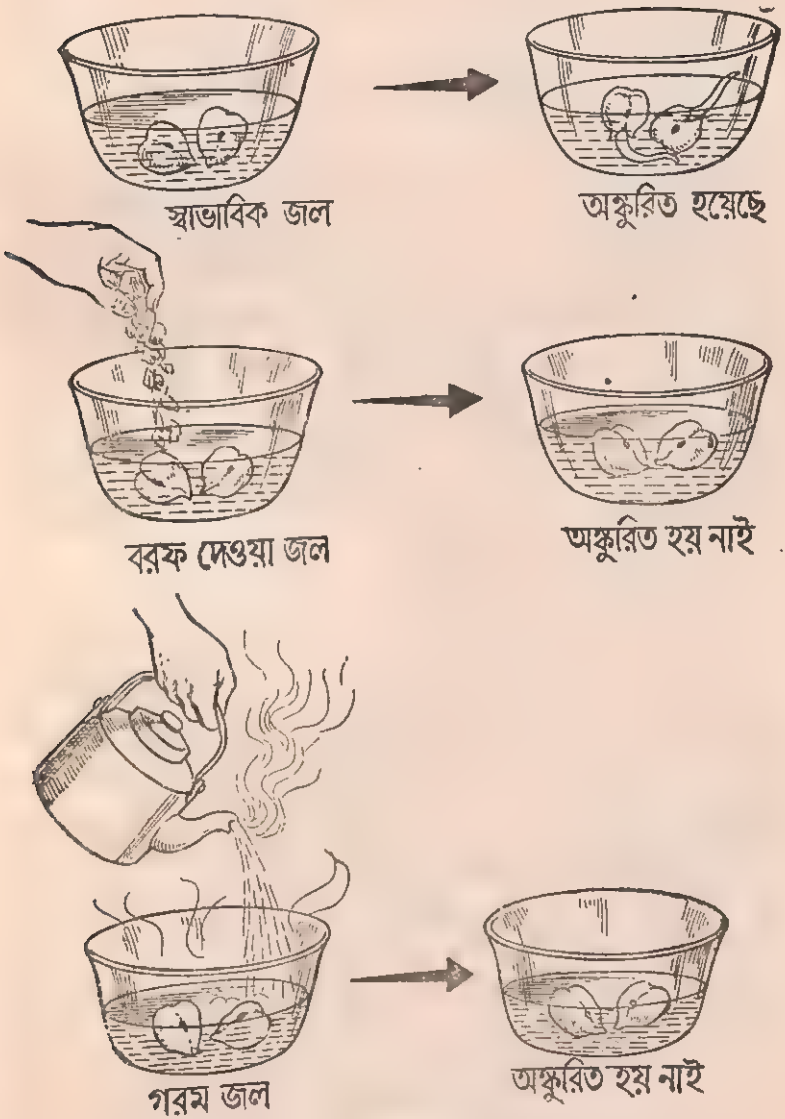

চিত্র ৪৭ ঃ অঙ্কুরোদ্গমের জন্য নির্দিষ্ট উষ্ণতার প্রয়োজন

লাফি করে কিন্তু ঠান্ডাঘরের মধ্যে রাখা ব্যাঙটি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ উষ্ণতার তারতম্য ব্যাঙের দেহের যন্ত্রগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। বেশী ঠাণ্ডায় ব্যাঙ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

বাতাস বা অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা

অক্সিজেন ছাড়া কোন জীবই বাঁচতে পারে না। বাঁচতে গেলে প্রতিটি জীবকে শ্বসন চালাতে হয়। শ্বসনের সময় জীব অক্সিজেন গ্রহণ করে। অক্সিজেন দেহের প্রতিটি কোষে পৌঁছায়। দেহের প্রতিটি কোষের কার্বন-ঘটিত খাদ্য (শর্করাজাতীয় খাদ্য) ওই অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে। ফলে খাদ্যের মধ্যে জমা শক্তি (স্থৈতিক শক্তি) থেকে কাজ করবার শক্তি (গতি শক্তি) বের হয় এবং কার্বন ডায়ক্সাইড সৃষ্টি হয়। এই কার্বন ডায়ক্সাইড আবার নিঃশ্বাসের সংগে বের হয়ে আসে। প্রতিটি জীবের দেহে এই কাজ অনবরত চলছে। জীব তার শ্বসনের জন্য বায়ুর অক্সিজেনের উপরই নির্ভর করে। জলে যে সব জীব থাকে তারা জল থেকেই অক্সিজেন নেয় বটে তবে জলেও বায়ুর অক্সিজেনই মিশে থাকে। জীব বায়ুর অক্সিজেন ছাড়া যে বাঁচতে পারে না তার সহজ পরীক্ষা নিচে দেওয়া হল।

প্রথম পরীক্ষা ঃ একই রকমের গাছ লাগানো দুটি টব নাও। টব দুটিকে টেবিলের উপর রাখ। টবের মাটিতে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জল দাও। সূর্যের আলো যাতে টেবিলে আসে সে দিকে লক্ষ্য রাখ। এখন দুটি বেলজারের মত কাচের বড় জার নাও। জার দুটির মুখ খোলা। এই মুখ ইচ্ছামত কর্ক দিয়ে খোলা বা বন্ধ রাখা যায়। টব দুটিকে এবার দুটি জার দিয়ে ঢাকা দাও। এখন একটি জারের সরু মুখটা কর্ক দিয়ে বন্ধ করে কর্কের উপর ভেসলিন লাগিয়ে বাতাস আসার পথ বন্ধ কর। জারটি যেখানে টেবিলের সংগে মিশেছে সেই জায়গার চারদিকেও ভেসলিন লাগিয়ে বাতাস আসার পথ বন্ধ কর। টব ঢাকা অন্য জারটির সরু মুখ খোলা রাখবে। তা দিয়ে বাতাস ঢুকবে। এই অবস্থায় টব দুটিকে কয়েকদিন রেখে দাও।

নিরীক্ষণ ঃ কয়েকদিন পর লক্ষ্য করে দেখ টবের গাছ দুটির কি অবস্থা হয়েছে—দেখবে যে টবের গাছটি সরু খোলা মুখ জার দিয়ে ঢাকা ছিল সেটি বেশ সতেজ রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় টবের গাছটি শুকিয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ বতাস (অক্সিজেন) ছাড়া জীবন ধারণের সব কিছু উপাদান পাওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় টবের গাছটি শুকিয়ে গেল। তাই বলা যায় অক্সিজেনের অভাবে গাছ বাঁচতে পারে না।

চিত্র ৪৮ ঃ বাতাসের প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা

দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ এবার দুটি জীবন্ত ইঁদুর নিয়ে পূর্বের মত পরীক্ষা কর। প্রথম ইঁদুরটিকে সরু খোলা মুখ জার দিয়ে ঢেকে দাও। দ্বিতীয়টিকে

বন্ধ মুখবিশিষ্ট জার দিয়ে ঢেকে দাও। প্রতিটি জার পাত্রের মধ্যে জল, খাবার রাখ। এইভাবে কয়েকদিন রেখে ইঁদুরগুলির অবস্থা লক্ষ্য কর।

নিরীক্ষণ ঃ প্রথম জারের ইঁদুরটি খাবার, জল ও বাতাস পেয়ে বেশ সুস্থই আছে। কিন্তু দ্বিতীয় জারের ইঁদুরটি খাবার ও জল পেল বটে কিন্তু বাতাসের অভাবে মারা গেল।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রাণী বাতাস ছাড়া বাঁচতে পারে না।

জলের প্রয়োজনীয়তা

জীবন ধারণের জন্য আলো ও বাতাসের মত জল প্রয়োজন। দেহেও জলের ভাগ কম হলেই আমাদের পিপাসা পায়। পিপাসায় আমরা অস্থির হয়ে উঠি। কিন্তু জল পানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই পিপাসা মিটে যায় এবং আরাম পাই। দেহের প্রতিটি কোষের জলের চাহিদা আছে। কারণ প্রোটোপ্লাজমের প্রধান উপকরণ জল। প্রোটোপ্লাজমের প্রায় ৭০/৯০ ভাগই জল। দেহের বিভিন্ন কাজ জলের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। খাদ্যসার জলের মাধ্যমে চলাচল করে। প্রাণীর রক্ত পরিবহণের কাজ করে জল। দেহের প্রতিটি বিপাকের কাজে জল প্রয়োজন; জল প্রাণিদেহের তাপও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতি জীবের দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের প্রয়োজন। কারণ আমাদের দেহ থেকে মল, মূত্র, ঘাম ও শ্বাসের সংগে অবিরাম জল বেরিয়ে যায়। দেহ থেকে যে জল বেরিয়ে যায় তা দেহের ভেতরের আবর্জনাকে ধুয়ে নিয়ে যায়। ফলে শরীর সুস্থ থাকে। এই আবর্জনা বের না হলে দেহের নানারূপ ক্ষতি হয় —এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। দেহ থেকে যে জল বের হয়ে যায়, সেটা পূরণ করবার জন্যই আমরা জলপান করি। দেহে জলের ভাগ কম হলেই চামড়া শুকিয়ে যায়—শরীরে নানা বিপর্যয় ঘটে।

গাছের পক্ষেও জল ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। গাছ কোন কঠিন খাদ্যই গ্রহণ করতে পারে না। মাটি থেকে প্রয়োজনীয় লবণ ও অন্য উপাদান জলে দ্রবীভূত অবস্থাতেই কেবল গাছ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া গাছের শর্করা-জাতীয় খাদ্যও জল ছাড়া হয় না। প্রতিটি কোষে জলের মধ্য দিয়েই খাদ্য

পরিবেশিত হয়। গাছের থেকেও জল নিয়ত বাষ্পের আকারে বের হয়ে যাচ্ছে। ফলে জলের চাহিদা মেটাতে গাছেরও প্রতিদিন জলের প্রয়োজন।

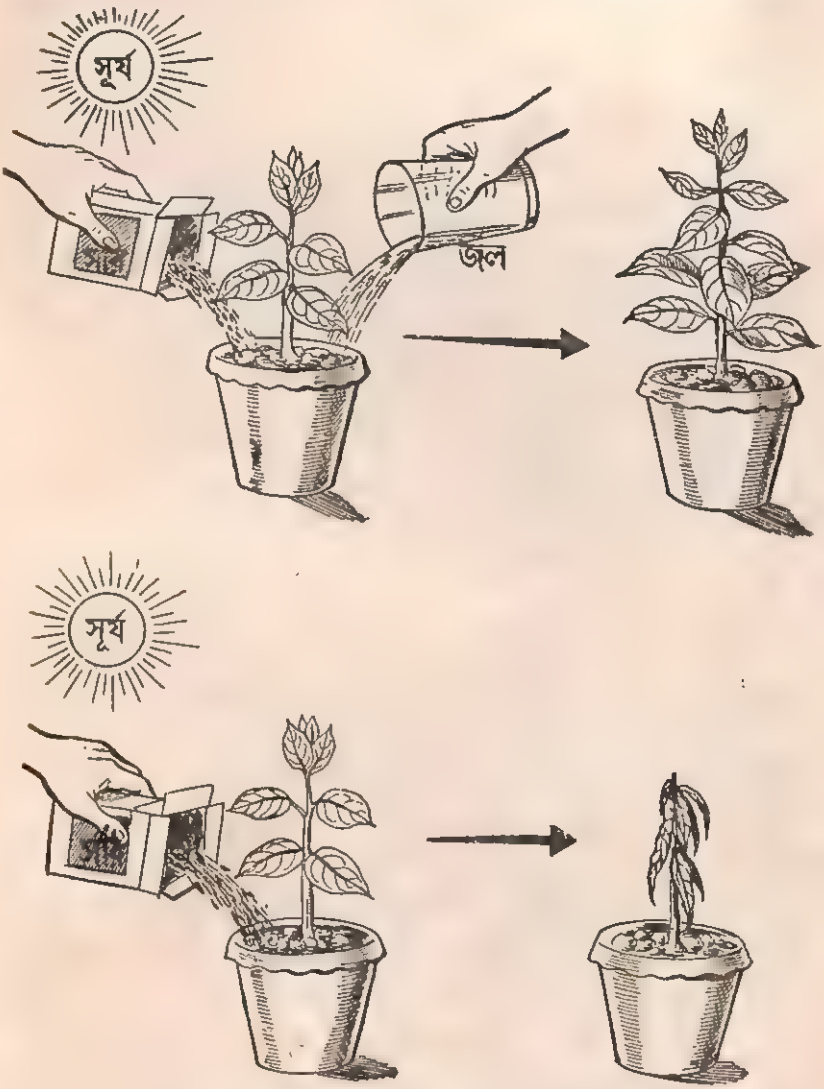

চিত্র ৪৯ ঃ জলের প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা

অতি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যায় যে জল ছাড়া জীব বাঁচে না।

জলের প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা

প্রথম পরীক্ষা ঃ একই রকমের গাছ লাগানো দুটি টব তোমার বাগান থেকে তুলে নিয়ে বাড়ীর বারান্দায় রাখ। দুটি টবের মাটিতেই একই প্রকার

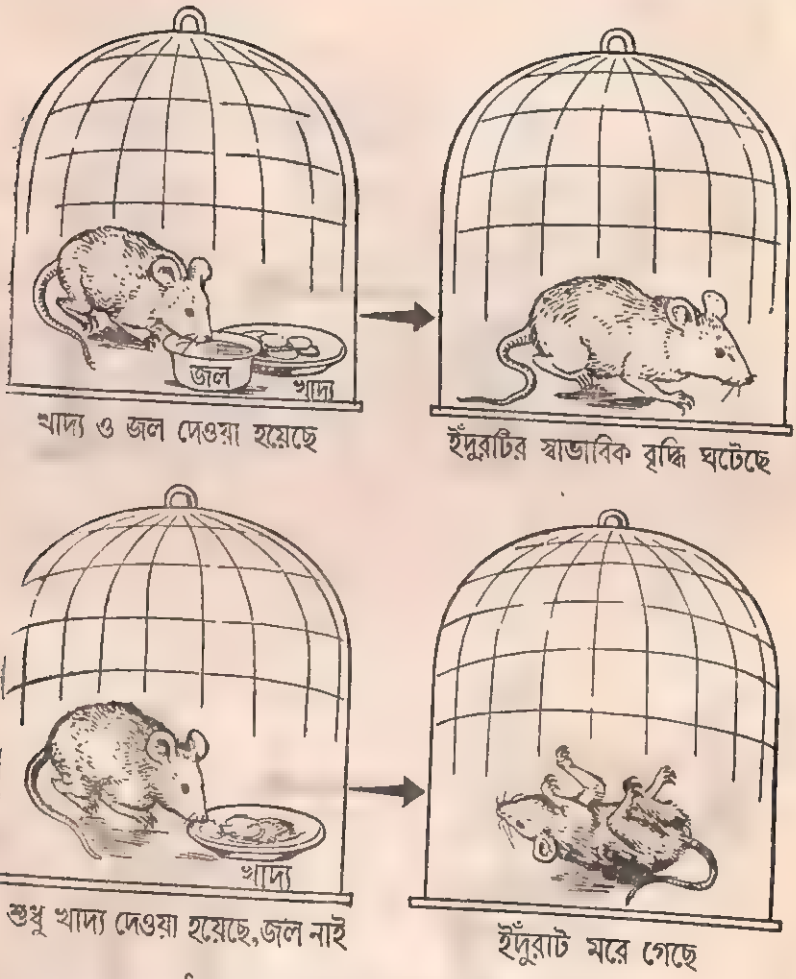

চিত্র ৫০ ঃ জলের প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা

সার দাও। উপরের ছবি, অর্থাৎ ১নং টবে প্রতিদিন জল দাও। নিচের ছবি, অর্থাৎ ২নং টবে মোটেই জল দেবে না।

নিরীক্ষণ : কয়েকদিন পর দেখবে উপরের টবের গাছ বেশ সতেজ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই গাছটি বেড়ে চলেছে। কিন্তু নিচের টবের গাছটি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন পর গাছটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে।

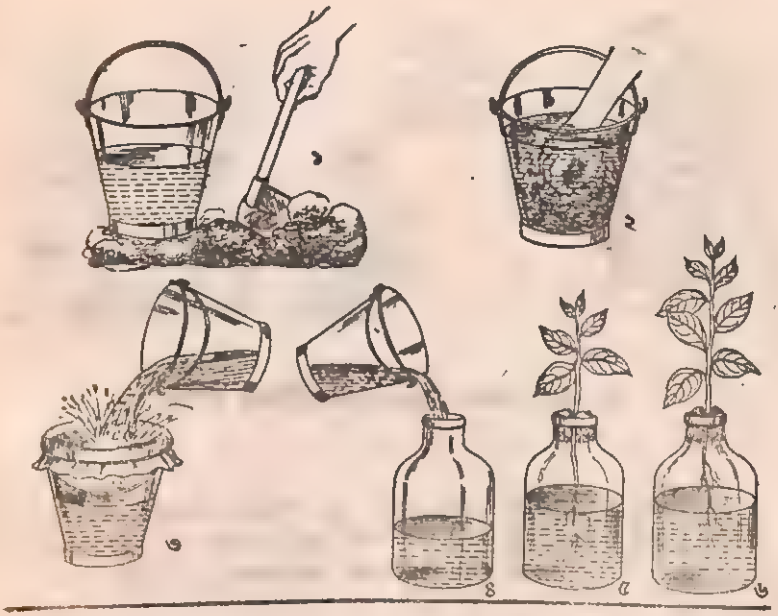

চিত্র ৫১ : গাছের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা

১—বাগানের সার দেওয়া মাটি জলে ঢালা হচ্ছে। ২—মাটি হাত দিয়ে জলে গোলা হচ্ছে। ৩—কাপড় দিয়ে ঐ জল ছেঁকে নেওয়া হচ্ছে। ৪—বোতলে সেই জল ঢালা হচ্ছে। ৫—চারাগাছ বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে তুলো দিয়ে মুখ বন্ধ করা হ'ল। ৬—কয়েকদিন পরে ঐ গাছের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেল।

সিদ্ধান্ত : নিচের টবের গাছটি জল ছাড়া সব কিছুই পেয়েছিল তা সত্ত্বেও শুকিয়ে গেল। অতএব জল ছাড়া গাছ বাঁচতে পারে না।

মন্তব্য : মাটিতে খাদ্য থাকলেও জলের অভাবে ২নং টবের গাছ সেই খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। এদিকে সূর্যের আলো, ক্লোরোফিল, বাতাসের কার্বন ডায়ক্সাইড সব কিছুই আছে। তবু জলের অভাবে শর্করাজাতীয় খাদ্যও প্রস্তুত হচ্ছে না। ফলে গাছটি শুকিয়ে গেল।

চিত্র ৫২ : গাছের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা

১—বৃষ্টির জল বালতিতে ধরা হচ্ছে। ২—ঐ জল বোতলে ঢালা হচ্ছে। ৩—আগের নিয়মে একই মাপের চারাগাছ লাগান হ'ল। ৪—কয়েক দিন পরে দেখা গেল গাছ মরে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা : দুটি ইঁদুর ধরে দুটি আলাদা খাঁচায় রাখ। ছবির মত উপরের খাঁচায় ইঁদুরের খাদ্য ও জল রেখে দাও। নিচের খাঁচায় শুধু খাদ্য রাখ কিন্তু জল রাখবে না। ইঁদুর দুটির কি অবস্থা হয় লক্ষ্য কর।

নিরীক্ষণ : দেখবে উপরের খাঁচার ইঁদুরটি বেশ সুস্থ আছে। কিন্তু নিচের খাঁচার ইঁদুরটি অস্থির হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কয়েকদিন পর ইঁদুরটি মারা গেল। নিচের খাঁচার ইঁদুর বাঁচার জন্যে জল ছাড়া প্রয়োজনীয় সব কিছুই পেল, তবুও বাঁচলো না।

সিদ্ধান্ত : জল ছাড়া কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না।

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

জীবের পুষ্টিসাধন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি ও কর্মশক্তি বজায় রাখার জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য ছাড়া কোন জীব বেঁচে থাকতে পারে না। নিয়ত কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা যে শক্তি হারাই, আমাদের দেহের যে ক্ষয় হয়, খাদ্য গ্রহণ করেই সেই শক্তিকে আবার আমরা ফিরিয়ে আনি। প্রতিটি জীবই খাদ্য গ্রহণ করে, তবে প্রতিটি জীবের খাদ্য একই রকম নয়। আবার প্রতিটি জীব একইভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে না

উদ্ভিদের কথাই ধরা যাক্। উদ্ভিদের বাঁচার জন্যে কমপক্ষে দশটি মৌলিক উপাদানের প্রয়োজন। এই উপাদানগুলির মধ্যে কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বাতাস থেকে পায়। কিন্তু অন্য উপাদান, অর্থাৎ নাইট্রোজেন, পটাশিয়ম, গন্ধক, ফসফরস, লোহ, ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম মাটি থেকে জল দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদ সংগ্রহ করে, একথা তোমরা পূর্বেই জেনেছ। উদ্ভিদের প্রোটীনজাতীয়, শর্করাজাতীয় ও স্নেহজাতীয় খাদ্য এগুলির থেকেই তৈরী হয়। খাদ্যের অভাবে উদ্ভিদের কি অবস্থা হয় তা পরীক্ষা করে দেখা যাক্।

পরীক্ষা ঃ প্রথমে ৫১নং ছবির মত বাগানের সার দেওয়া মাটি বালতিতে ঢেলে হাত দিয়ে বেশ করে গুলে নাও। তারপর সেটা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নাও। পরিষ্কার একটা বোতলে ঐ জল নিয়ে তাতে সদ্য তোলা সমান মাপের সতেজ দুটো গাছের একটিকে ঢুকিয়ে তুলো দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দাও। দেখবে গাছটির শেকড় যেন জলে ডুবে থাকে।

একইভাবে এবার ৫২নং ছবির মত একটা বালতিতে বৃষ্টির জল ধর। আগের মত একইভাবে একটা বোতলে ঐ জল রেখে তাতে অন্য গাছটি ঢুকিয়ে দাও ও মুখ তুলো দিয়ে বন্ধ কর। এক্ষেত্রেও যেন মূল জলে ডুবে থাকে। এইভাবে বোতল দুটিকে কয়েকদিন রেখে দাও।

নিরীক্ষণ ঃ বেশ কিছুদিন বাদে লক্ষ্য করলে দেখবে প্রথম বোতলের গাছটি বেড়ে উঠেছে আর অন্য বোতলের গাছটি শুকিয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত ঃ এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বাঁচার জন্যে গাছের খাদ্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রাণীরও দেহধারণের জন্যে প্রয়োজন প্রোটীনজাতীয়, শর্করাজাতীয়, স্নেহজাতীয় ও লবণজাতীয় খাদ্য। আমরা ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, রুটি ঘি প্রভৃতি যা খেয়ে থাকি তার মধ্যে থেকেই ওই উপাদানগুলি পাই। অর্থাৎ ওগুলোই

হচ্ছে পুষ্টিকর খাদ্য। এই উপাদানের কোনটির অভাবেই প্রাণী সুস্থ থাকতে পারে না। তাদের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে।

পরীক্ষা ঃ তিনটি একই আকারের একই বয়সের ইঁদুর নাও। তাদের আলাদা আলাদাভাবে রাখার ব্যবস্থা কর। ছবিতে দেখান উপরের ইঁদুরটিকে নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য (অর্থাৎ, প্রোটীন, শর্করা, স্নেহ ও লবণজাতীয়) খেতে দাও। মধ্যেরটিকে পুষ্টিকর খাদ্য দেবে না। নিচের ইঁদুরটিকে কোন খাদ্যই দেবে না। এখন ইঁদুর তিনটির বৃদ্ধি ও পুষ্টি লক্ষ্য কর।

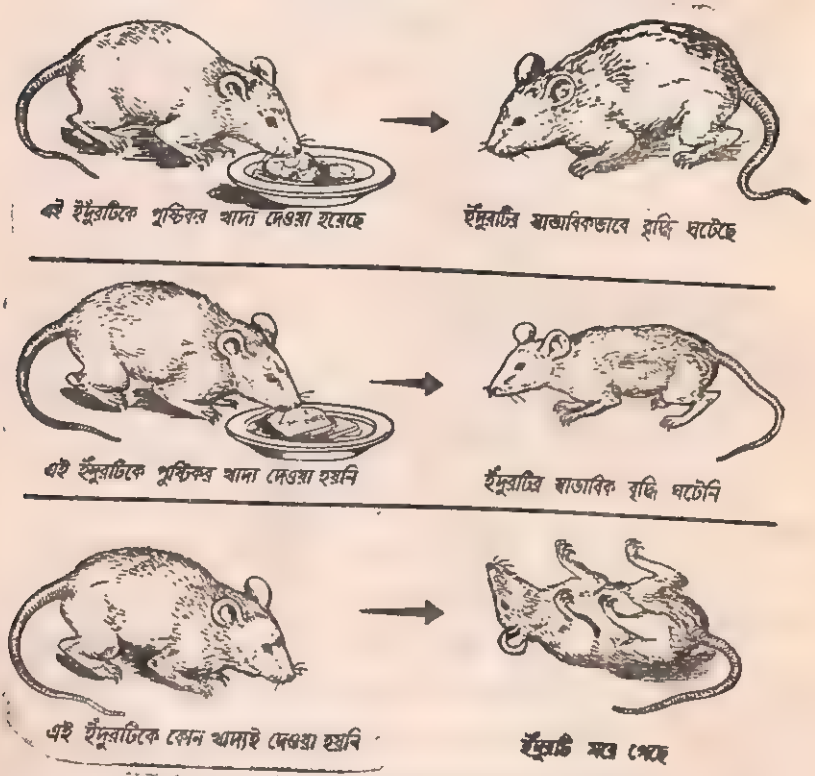

চিত্র ৫৩ ঃ প্রাণীর ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা

নিরীক্ষণ ঃ কয়েকদিন পরে ইঁদুরগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে উপরের ইঁদুরটি বেশ সুস্থ ও সবল আছে। তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছে। এদিকে মধ্যের ইঁদুরটির দেহ ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে পড়েছে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সেটি কর্মশক্তি হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। নিচের ইঁদুরটি মরে গেছে। কারণ তাকে কোন খাদ্যই দেওয়া হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ দৈহিক গঠন, পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে প্রতিটি জীবের পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন।

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। বাঁচার জন্য উদ্ভিদের যে আলোর প্রয়োজন তাহা পরীক্ষার সাহায্যে দেখাও।

২। মানুষের বাঁচার জন্য প্রত্যক্ষভাবে আলোর প্রয়োজনীয়তা আছে কি? একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা কিভবে আলোর দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয় দেখাও।

৩। অংকুরোদ্গমের জন্য কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতা আছে কি? যদি থাকে তবে তাহা একটি সহজ পরীক্ষা মাধ্যমে প্রমাণ কর।

৪। "জীব মাত্রেই বাঁচার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন"—এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করার জন্য তুমি কি কি পন্থা অবলম্বন করিবে?

৫। বাঁচতে গেলে একটি প্রাণীকে যে বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করিতে হয় তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

৬। জল ছাড়া কোন জীব যে বাঁচে না তাহা কি ভাবে পরীক্ষাগারে প্রমাণ করিবে?

৭। জীবন ধারণের জন্য যে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন তাহা পরীক্ষাগারে প্রমাণ কর।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা
[Objective Test]

Yes or No Type :

৮। **যেটি ঠিক তার ডানপাশে 'হ্যাঁ' এবং যেটি ঠিক নয় তার পাছে 'না' লেখ।**

(ক) গাছের বাঁচার জন্য আলোর প্রয়োজন হয়।

(খ) পুষ্টির জন্য গাছ ও প্রাণীর সকলেরই খাদ্য প্রয়োজন।

(গ) বাঁচার জন্য জল না হইলে চলে কি?

(ঘ) প্রাণী অক্সিজেন না হইলেও বাঁচে কি?

৯। **এককথায় উত্তর দাওঃ**

(ক) বাঁচার জন্য কি ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন?

(খ) উদ্ভিদ মাটি হইতে কি অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করে?

(গ) আলোর অভাবে উদ্ভিদ কি উৎপাদন করার ক্ষমতা হারায়?

১০। **শুদ্ধ করিয়া লেখঃ**

(ক) আলো ছাড়া উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে?

(খ) প্রাণী নিজ দেহে খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে।

(গ) উদ্ভিদ বাতাস হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করে।

১১। **শূন্যস্থান পূরণ করঃ**

(ক) — জীবনের সার পদার্থ।

(খ) উদ্ভিদ — খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে — সূর্যালোকে।

(গ) জীব তার — জন্য বায়ুর — উপরেই নির্ভর করে।

(ঘ) দেহ থেকে যে — বেরিয়ে যায় তা দেহের ভিতরের — ধুয়ে নিয়ে যায়।

(ঙ) উদ্ভিদের বাঁচার জন্যে কমপক্ষে — মৌলিক — প্রয়োজন।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN.
Deptt of Extension Services.
CALCUTTA-27

৫ বহিরাকৃতি
[External Structures]

প্রত্যেকটি জীবের নিজস্ব চেহারা আছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রত্যেকটি জীবের দেহগঠনে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ফুটে ওঠে; পৃথিবী যেমন বিশাল, তার সংগে পাল্লা দিয়ে আছে অসংখ্য জীব। এদের সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান বাড়াতে গেলে সবার আগে দরকার এদের ঠিক ঠিক চেনা। এই চেনার কাজটা সম্ভব হয় যদি তোমরা এদের ঐ লক্ষণগুলো চেনো। জীবকে চেনার জন্যে তাদের খুব খুঁটিয়ে দেখতে হবে। তাদের পরস্পরের বহিরাকৃতির আলোচনা করতে হবে।

নিচে গাছ ও প্রাণীর বহিরাকৃতির আলোচনা করা হল।

মটর গাছের বহিরাকৃতি

মটর বিরুৎ জাতীয় গাছ। এদের কাণ্ড নরম। গাছ একটু বড় হলেই মাটিতে শুয়ে পড়ে। তবে কোন অবলম্বন পেলে তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করে। এই উপরে ওঠার চেষ্টা করার অর্থ কি বলত? তোমরা জান আলো না হলে গাছ বাঁচে না। কেননা সবারই খাদ্য চাই। এ গাছগুলো কাছাকাছি এত বেশী হয় যে, দরকার মত আলো পায় না। এজন্যে মাথা উঁচিয়ে এরা উপরের দিকে উঠতে চায়।

মটর গাছ জন্মাবার পর এক বৎসরের মধ্যে ফুল ফুটিয়ে, ফল তৈরী করে মরে যায়। এরা এক ধরনের রবিশস্য। মটর গাছ একবারই কেবল শস্যদান করতে পারে। এজন্যেই এদের ওষধি গাছ বলা হয়।

মটর গাছকে মোটামুটি প্রধান তিনটি অংশে ভাগ করা যায়—

১। মূল আর তার শাখা-প্রশাখা।

২। কাণ্ড আর তার শাখা-প্রশাখা।

৩। পাতা।

৪। ফুল, ফল।

মূলের বিবরণ

একটি ছোট্ট মটর চারা পরীক্ষা করলে দেখবে এর বেশীর ভাগ অংশ মাটির উপরে আর কিছুটা অংশ মাটির নিচে রয়েছে। গাছটিকে মাটি থেকে তুলে পরীক্ষা কর। যে অংশটি মাটির নিচে ছিল সেটাই মূল বা শিকড়।

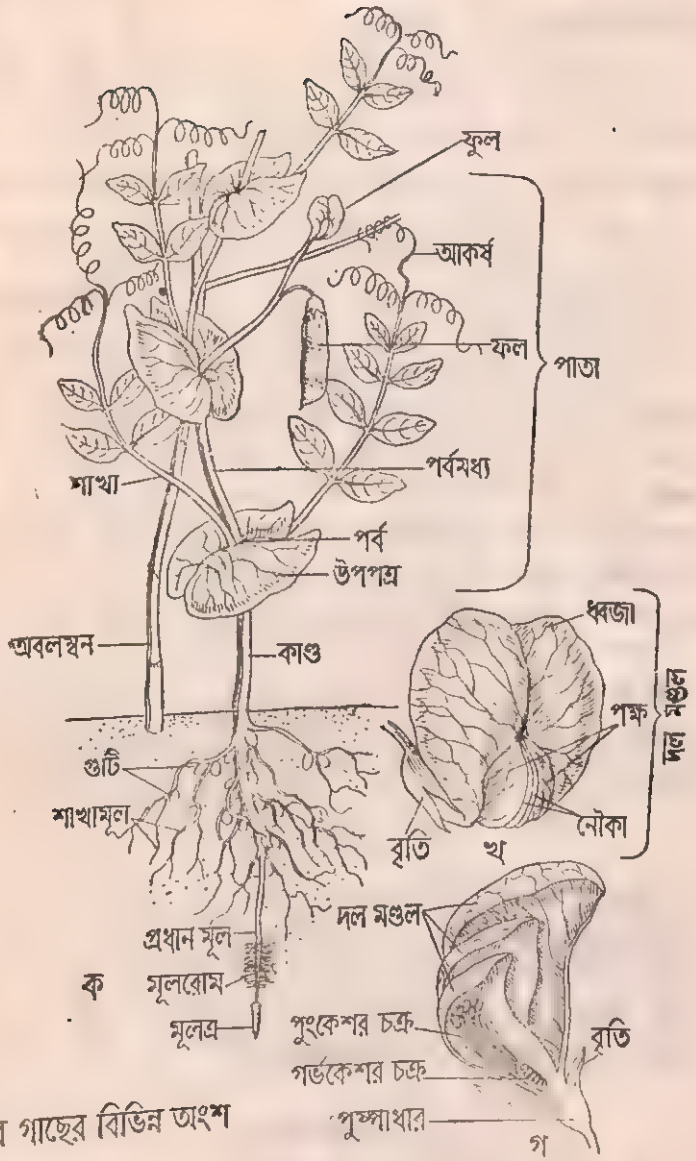

মটর গাছের বিভিন্ন অংশ

চিত্রঃ ৫৪

মাটির উপরের অংশটা কান্ড। এখন এ গাছটিকে জন্ম থেকে পর্যবেক্ষণ কর। মটর বীজ মাটিতে পোঁত। দেখ কি হয়।

বীজ অঙ্কুরিত হলে প্রথমেই যে সাদা অংশটা বীজের বাইরে চলে এল সেটাই আদি মূল। এইজন্যে এর নাম **ভ্রূণমূল**। ভ্রূণমূল বাড়তে বাড়তে ক্রমশঃ মাটির ভিতর চলে যায়। একে **প্রধান মূল** বলে। **প্রধান মূল** কান্ডের গোড়ায় আরম্ভ হয়। এটা ক্রমশঃ সরু হয়ে মাটির নিচে অনেকদূর চলে যায়। প্রধান মূলের চারপাশ থেকে অনেক শাখা বেরোয়। এই শাখাগুলোকে **শাখা-মূল** বলে। শাখা থেকেও আবার ভাগ হয়ে **প্রশাখামূল** তৈরী হয়।

মূল মাটির মধ্যে বাড়ে মাটির কণার সঙ্গে ঘঁসা খেয়ে নরম মূলের আগাটায় আঘাত লাগতে পারে। সেজন্যে প্রত্যেকটি মূলের আগায় একটা করে টুপির মত জিনিস থাকে। একেই বলে **মূলটুপি** বা **মূলত্র**। মূলত্রের কিছুটা পেছনে সুতোর মত সরু ও লম্বা অসংখ্য রোম বেরোয়। এই রোম-গুলোকে **মূলরোম** বলে। মূলরোম যত লম্বাই হোক্ না কেন তা কেবল একটা মাত্র কোষ দিয়ে তৈরী। এরা মূলের অনেকটা অংশ জুড়ে থাকে। মূলরোম মাটি থেকে খাদ্য শোষণ করতে পারে। মাটির জলে নানারকম খনিজ লবণ মিশে থাকে। এগুলোকেই মূলরোম টেনে নেয়। **মূল গাছকে এমন-ভাবে মাটির** সঙ্গে আটকে রাখে যাতে বাতাসের চাপে গাছটি উপড়ে না যায়।

মটর মূলের বিশেষত্ব হচ্ছে যে সেখানে অসংখ্য ছোট ছোট গুটি হয়। গুটির মধ্যে **বাইজোরিয়ম** নামে একরকমের জীবাণু বাস করে। এরা বাতাসের নাইট্রোজেন ঐ গুটির মধ্যে ধরে নাইট্রোজেনঘটিত সার তৈরী করায় সাহায্য করে। মটর গাছ এই সার নিয়ে প্রতিদানে জীবাণুকে খাদ্য সরবরাহ করে।

কান্ডের বিবরণ

মটর গাছের কান্ডটি ফাঁপা নলের মত। কান্ডটির নির্দিষ্ট কতকগুলি জায়গা থেকে পাতা গজায়। এ জায়গাগুলোকে বলে পর্ব। দুটো পর্বের মধ্যের জায়গাটাকে বলে **পর্বমধ্য**। পর্ব থেকে পাতা আর পাতার কক্ষ থেকে কুঁড়ি গজায়। এই কুঁড়িগুলোকে বলে **কক্ষ মুকুল**। আর কান্ডের আগার মুকুলকে বলে **অগ্রমুকুল** বা **শীর্ষমুকুল**।

পাতার বিবরণ

অনেকগুলো ছোট ছোট পাতার মত অংশ (**পত্রক** বা **অনুফলক**) নিয়ে গোটা পাতাটি তৈরী হয়। অর্থাৎ এই পত্রগুলো এক একটা গোটা পাতা নয়।

এগুলো পাতার অংশ। পাতার আগাটি নিচের অনেকগুলো পত্রকসহ আকর্ষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। নিচের অনুফলকগুলো বিপরীত দিকে পর পর সাজান থাকে। এই ধরনের অনুফলকযুক্ত পাতাকেই যৌগপত্র বলে। প্রত্যেক পর্বকে ঘিরে পাতার গোড়ার ফলকের মত দেখতে যে পাতলা অংশ থাকে তাকেই বলে উপপত্র। উপপত্রের কোল থেকে পাতার বৃন্ত বা বোঁটা বেরোয়।

ফুলের বিবরণ

গাছ পরিণত হলে তাতে ফুল হয়। কাণ্ডের আগার দিকের পাতাগুলির কক্ষ থেকেই ফুল বেশী পরিমাণে জন্মায়। একটা ফুল অথবা কখনও কখনও একটা দণ্ডের উপরে দু-তিনটি ফুল জন্মায়। দণ্ডসহ ফুলটিকে বলে পুষ্প-বিন্যাস। মটর ফুলের ছোট একটা বৃন্ত আছে। মটর ফুলের আকার সত্যি দেখবার মত। এদের রং বেশীর ভাগই বেগুনী, কখনও কখনও সাদা।

মটর ফুল পরীক্ষা করলে নিচের অংশগুলো দেখতে পাবে।

বৃতি

ফুলের একেবারে নিচে সবুজ রংয়ের আবরণটিকে বলে বৃতি। বৃতি পাঁচটা দাঁতের মত অংশ নিয়ে তৈরী। এই অংশগুলোকে বলে বৃত্যংশ। কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের বাইরের অংশটাতে জড়িয়ে থেকে বৃতি রোদ বৃষ্টি থেকে ফুলকে রক্ষা করে।

দলমণ্ডল

বৃতির ভেতরে যে রঙ্গীন স্তবকটা থাকে তাকেই বলে দলমণ্ডল। পাঁচটি রঙ্গীন পাপড়ি নিয়ে দলমণ্ডল তৈরী হয়। পাপড়ির রং হয় বেগুনী না হয় সাদা, পাপড়িগুলো সমান আকারের নয়। বাইরের দিকে সবচেয়ে বড় যেটা তাকে ধ্বজক বা ধ্বজা বলে। অন্য চারটি পাপড়িকে ধ্বজা ঢেকে রাখে। ধ্বজার ভিতরের দুটি বাঁকান পাপড়িকে বলে পক্ষ। কেননা পক্ষকে দেখতে ডানার মত। পক্ষের ভিতরে নৌকোর মত দেখতে একসঙ্গে জুড়ে যাওয়া দুটো ছোট ছোট পাপড়িকে বলে তরীদল বা নৌকা। দলমণ্ডল রঙ্গীন আর সুগন্ধী হওয়ায় ফুলের সৌন্দর্য বাড়ে। এজন্যেই দূর থেকে কীটপতঙ্গ ছুটে ছুটে এদের কাছে চলে আসে।

পুংকেশরচক্র

দলমণ্ডলের ভিতরে পুংকেশরচক্র দেখা যায়। মোট দশটি পুংকেশর নিয়ে এটা তৈরী। নয়টি পুংকেশর একটা গোছায় থাকে আর মাত্র একটা থাকে আলাদা।

পুংকেশরের দুটি অংশ। নিচের সরু ডাঁটার মত অংশকে বলে **পুংদণ্ড বা পরাগদণ্ড**; আর মাথায় মোটা অংশটাকে বলে **পরাগধানী বা রেণুস্থলী**। এই পরাগধানীতে হলদে হলদে পরাগ বা রেণু তৈরী হয়।

গর্ভকেশরচক্র

ফুলের ঠিক মাঝখানে এটা থাকে। এর তিনটি অংশ। নিচের মোটা চ্যাপ্টা ফাঁপা অংশটিকে বলে **ডিম্বাশয় বা গর্ভকোষ**। ডিম্বাশয়টি উপরের দিকে হঠাৎ সরু হয়ে বেঁকে গেছে। এই সরু অংশটাকে বলে **গর্ভদণ্ড**। গর্ভদণ্ডের আগাটা চ্যাপ্টা পাখীর পালকের মত, একে বলে **গর্ভমুণ্ড**।

ফলের বিবরণ

মটর ফলকে আমরা মটরশুঁটি বলি। দুটো সবুজ খোসা দিয়ে তৈরী এই শুঁটির ভিতরে একসারে কতকগুলো সবুজ বীজ সাজানো থাকে। ফলের শাঁস নাই। ফল পাকলে দুদিকে ফেটে বীজগুলো চারদিকে ছড়িয়ে যায়। ফলগুলিকে তাই স্ফোটক ফল বলে। বীজ থেকে আবার সুযোগ-সুবিধে মত নতুন গাছ জন্মায়।

মাছের বহিরাকৃতি

তোমরা অনেক রকমের মাছ দেখেছো। কি করে এদের দেখে চিনবে

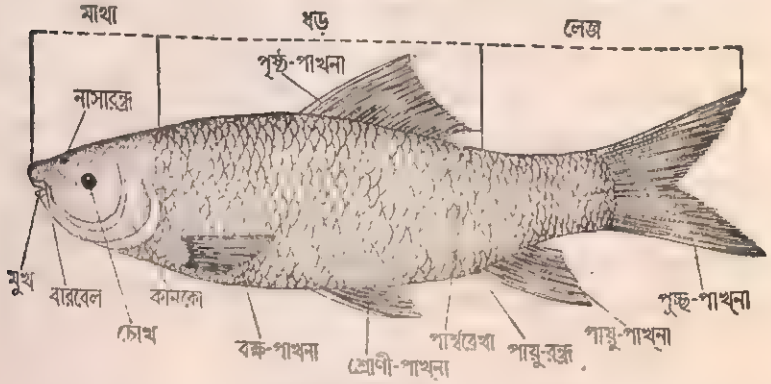

চিত্র ৫৫ : রুই মাছ

কোনটা রুই, কোনটা কাতলা, কোনটা শিঙি, কোনটা মাগুর? তুমি এদের গঠনের কতকগুলো লক্ষণ চেনো তাই তোমার পক্ষে এদের চেনা সহজ। সবাই

তোমার মত সব মাছ না-ও চিনতে পারে। তুমিও হয়ত অনেক মাছই চেনো না। এদের চিনতে কোনই কষ্ট নাই। এদের ভালভাবে চেনা যায় এদের লক্ষণগুলো দেখে। এইভাবে এক জাতের মাছকে অন্য জাতের মাছ থেকে আলাদা করা সহজ হয়। এস দেখি কোন্ মাছের বহিরাকৃতি কেমন।

রুই মাছ

রুই আমাদের অতি পরিচিত মাছ। পুকুরের ঘেটো রুই, খাল, বিলের মস্ত বড় পাকা রুই তো আমরা অনেকেই দেখি। রুই মাছের দেহের রং সাধারণতঃ লালচে হয়। এদের দেহের তিনটে অংশ।

(১) মাথা—মুখের সামনে থেকে কানকো পর্যন্ত অংশ মাথা। (২) ধড়—কানকোর পর থেকে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত অংশ ধড়। (৩) লেজ—পায়ুছিদ্রের পর থেকে দেহের শেষ পর্যন্ত অংশকে বলে লেজ। সারা দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকা-ই এই মাছের বিশেষত্ব। তবে মাথায় আঁশ থাকে না। আঁশগুলো একটার উপরে একটা খুব সুন্দরভাবে সাজান থাকে। তিনকোণা মাথার সামনে সামান্য নিচের দিকে মুখ অবস্থিত। মুখের দুপাশে দুটো ছোট শুঁড় বা বারবেল আছে। মুখের পেছনে দেহের দুধারে দুটি নাসারন্ধ্র দেখা যায়। এরই পিছনে মাথার মাঝামাঝি রয়েছে চোখ। চোখের উপর নিচ কোন পাতা নাই। তবে তৃতীয় পাতা বা নিকটিটেটিং-মেমব্রেন নামে চোখকে ঢেকে রাখার মত পাতলা পর্দা আছে। এটা স্বচ্ছ। মাথার দুপাশে চওড়া আধখানা চাঁদের মত হাড়ের তৈরী দুটো কানকো আছে। এগুলো ফুলকা প্রকোষ্ঠকে ঢেকে রাখে। কানকোর সামনের দিক জোড়া, পিছনের দিক খোলা। খোলা দিকের যে পাতলা ঝিল্লী আছে তাকে বলে ব্রাংকিওস্টিগাল মেমব্রেন। কানকোর পিছন থেকে দেহের দুপাশ বরাবর লেজ পর্যন্ত দুটি লম্বা রেখা আছে। এদুটিকে পার্শ্বরেখা (স্পর্শেন্দ্রিয়) বলে। পার্শ্বরেখা খুব সংবেদ। ধড় যেখানে লেজের সঙ্গে মিশেছে সেখানে পেটের দিকে যে ছিদ্র তাকে বলে পায়ুছিদ্র।

রুই মাছের দেহে মোট সাতটি পাখনা আছে। প্রত্যেক পাখনায় কতকগুলো শক্ত কাঁটার মত হাড় আছে। এদের রশ্মি বলে। ধড়ের দুদিকে কানকোর পিছনের পাখনা দুটোকে বক্ষ পাখনা বলে। ধড়ের মাঝামাঝি জায়গায় পেটের দিকের পাখনা দুটোকে শ্রোণী পাখনা বলে। তিনকোণা যে পাখনাটি পিঠের মাঝামাঝি জায়গায় থাকে তাকে বলে পৃষ্ঠ পাখনা। আর আছে পায়ুর পেছনে একটি পায়ু-পাখনা। লেজের শেষে বড় দুভাগে ভাগ করা পাখনাটি পুচ্ছ-পাখনা।

মাগুর মাছ

খাল, বিল, পুকুরের পাঁকে মাগুর মাছ জন্মায়। এদের জল থেকে তুলে ভাঙ্গায় রাখলেও অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে। কেননা বায়ুতে শ্বসনকার্য চালাবার জন্যে এদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। এজন্য মাগুর মাছকে **জিয়ল মাছ** বলে। শিঙি, কই প্রভৃতিও একই জাতের মাছ। নিচে রুই মাছের সঙ্গে এর প্রভেদই কেবল উল্লেখ করা হল।

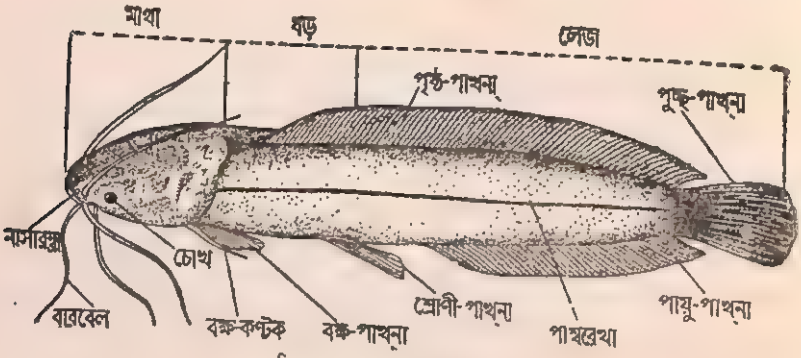

চিত্র ৫৬ ঃ মাগুর মাছ

মাগুর মাছের মাথা চ্যাপ্টা আর চওড়া। মাথাটা খুব পাতলা চামড়ায় ঢাকা। অঙ্কদেশে মুখছিদ্র আছে। মুখকে ঘিরে অনেকগুলো লম্বা শুঁড় বা বারবেল দেখা যায়। এদের দেহে পিচ্ছিল আর আঁশও থাকে না। এর পৃষ্ঠ পাখনা মাথার পেছন থেকে লেজ পর্যন্ত চলে গেছে। এর ফিনরেগুলি নরম। বক্ষ পাখনায় থাকে এগারটি ফিনরে। বক্ষ পাখনার পেছনে শ্রোণী পাখনা আকারে ছোট। এতে আছে ছটি ফিনরে। শ্রোণী পাখনা দুটির মাঝে দুটো গোল ছিদ্র দেখা যায়। এদের একটা পায়ুছিদ্র অপরটি জননছিদ্র। পায়ুছিদ্রের পেছনের লম্বা সরু একক পাখনাকে পায়ু-পাখনা বলে। এদের পুচ্ছ-পাখনা ছোট আর গোল।

মানুষ

মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর সেরা জীব। তোমরা ছাত্ররা হচ্ছ মানুষের প্রতিনিধি। তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা দরকার।

মানুষের শরীর মাথা, ঘাড়, ধড়, বাহু ও পা-এ বিভক্ত। দেহ চর্ম বা চামড়া দিয়ে ঢাকা। চামড়ার রং ফরসা বা কাল।

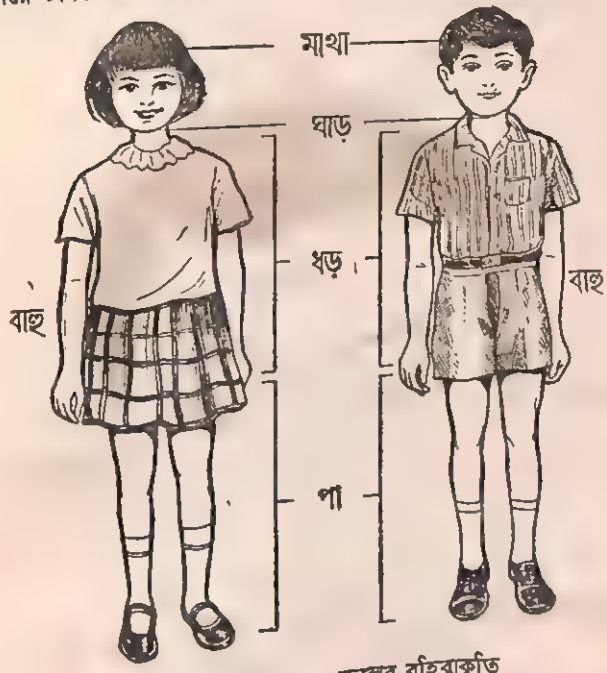

চিত্র ৫৭ : মেয়ে ও ছেলের বহিরাকৃতি

মাথার দুটি ভাগ—খুলি আর **মুখমণ্ডল**। মাথার খুলি **ধলে** ভর্তি। খুলির সামনের দিকে কপাল। কপালের নিচে দুদিকে দুটো **চোখ**। চোখের উপরে ভ্রু। চোখ দুটি চোখের পাতায় ঢাকা। চোখের মাঝখানে **তারারন্ধ্র**। একে ঘিরে **কনীনিকা**। চোখ দুটোর মাঝখানে **নাক**। নাকের গর্ত হল **নাকারন্ধ্র**। নাকের নিচে মুখ। মুখকে ঘিরে আছে দুটো **ঠোঁট**। উপরের ঠোঁটের মাঝে একটা লম্বা খাদ আছে। এটা নাসারন্ধ্র দুটির ব্যবধায়কের নিচে পর্যন্ত চলে গেছে। এর নাম **মধ্যবর্তী খাত**। এ খাত মানুষের বৈশিষ্ট্য অন্য কোন প্রাণীর নাই। ঠোঁট দুটির উপরে নাকের দুপাশের অংশ **গাল** আর নিচের অংশ **চিবুক**। মাথার দুপাশে আছে **কান**। মাথা আর ধড়ের মধ্যের অংশ **ঘাড়**। ধড়ের উপরের সমতল অংশের নাম **কাঁধ**। ধড়ের উপরের আর সামনের দিকটাকে ছাতি বলে। ছাতির নিচের অংশ **বুক**। আরও নিচের মোটামুটি সরু অংশ **কোমর**। কোমরের নিচের কিছুটা চওড়া অংশ উদর।

উদরের নিচের অংশে থাকে **লিঙ্গ**। উদরের উপরে মাঝ বরাবর যে গোল ছিদ্র থাকে তাকে বলে **নাভি**।

চিত্র ৫৮ ঃ মাথার বিভিন্ন অংশ

ধড়ের পিছন দিকের উপরের অংশ **পিঠ**। ঘাড় থেকে পিঠের মধ্যে দিয়ে

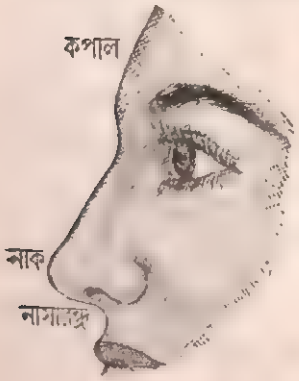

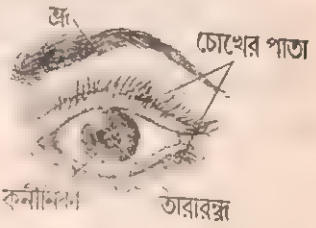

চিত্র ৫৯ ঃ চোখ ও মুখের অংশ

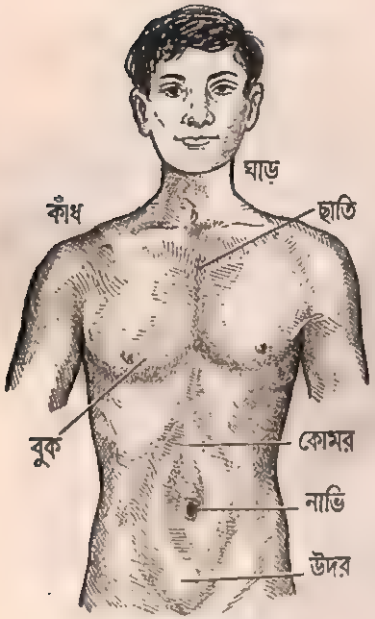

চিত্র ৬০ ঃ ঘাড় ও ধড়ের সামনের অংশ

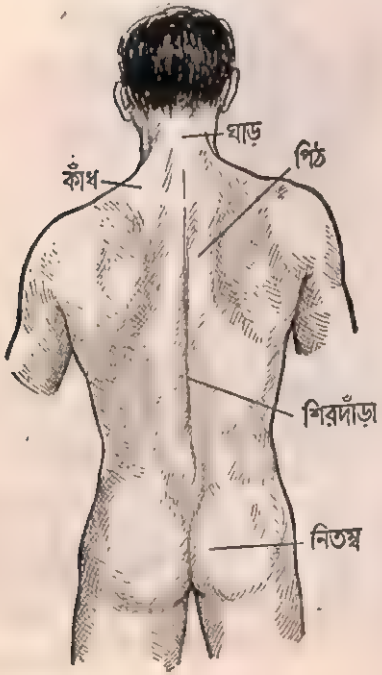

চিত্র ৬১ ঃ ঘাড় ও ধড়ের পিছনের অংশ

নিচে পর্যন্ত যে খাদ তার নাম **শিরদাঁড়া**। নিচে যেখানে শিরদাঁড়া শেষ হয়েছে দুদিকের পা সুরু হয়েছে সেই অংশকে বলে **নিতম্ব**।

মানুষের দুটো হাত। ধড়ের উপরে কাঁধের দুপাশ থেকে দুটো হাত বেরিয়েছে। কাঁধ থেকে যে মোটা অংশ বেরিয়েছে তাকে বলে প্রগণ্ড বা **উর্ধ্ব-**

চিত্র ৬২ঃ উর্ধ্ববাহু (প্রগণ্ড) ও বাহু

চিত্র ৬৩ ঃ হাতের অংশ

বাহু। উর্ধ্ববাহুর নিচের অংশ **বাহু**। উর্ধ্ববাহু আর বাহুর সংযোগ স্থলটাকে বলে **কনুই**। বাহুর সঙ্গে হাত যে অংশে যুক্ত থাকে তাকে বলে **কব্জি**। হাতের চওড়া অংশকে **হাতের পাতা** বলে। এর সঙ্গে থাকে পাঁচটা করে আঙ্গুল। মোটাটি বুড়ো আঙ্গুল প্রত্যেক আঙ্গুলের ডগায় আছে আঙ্গুলের নখ। নখ ছাড়া হাতের বা দেহের প্রায় সর্বত্র চুল বা লোম দিয়ে ঢাকা। মানুষের ধড়ের নিচে দুটো পা যুক্ত। পায়ের উপরের অংশটা স্থূল। এর নাম **উরু**। উরু ক্রমশঃ নিচে নেমে পায়ের নিম্নাংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যে জায়গায় তাকে **জানু** বলে। পায়ের একেবারে নিচে চওড়া যে অংশ মাটিতে

পাতা থাকে তাকে চরণ বলে। চরণ আর পায়ের সন্ধিস্থলকে বলে **গোড়ালি**।

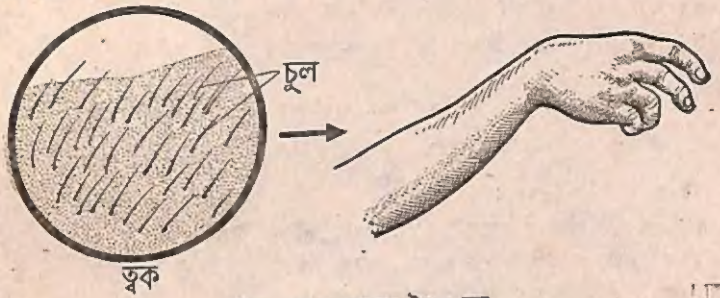

চিত্র ৬৪ ঃ বাহুর উপর চুল

চিত্র ৬৫ ঃ পায়ের বিভিন্ন অংশ

চরণের পাঁচটি আঙ্গুল আছে। আঙ্গুলের আগায় আছে **পায়ের নখ**।

হাত বা পায়ের পাতা ছাড়া সর্বাঙ্গ চুলে ঢাকা থাকে।

সাধারণ প্রশ্ন

১। মটর গাছের বহিরাকৃতি বর্ণনা কর। একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র আঁকিয়া বিভিন্ন অংশ লেবেল কর।

২। রুই মাছকে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে মাগুর মাছ হইতে পৃথক করা যায়? রুই মাছের বহিরাকৃতির ছবি আঁক ও বিভিন্ন অংশ লেবেল কর।

৩। মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশের চিত্র আঁকিয়া লেবেল কর।

৪। মানুষের দেহের বিভিন্ন অংগের নাম লেখ।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

[Objective Test]

Yes or No Type :

৫। প্রতিটি প্রশ্নের পাশে 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখিয়া উত্তর দাও।

(ক) মটর গাছের কাণ্ডে আকর্ষ আছে কি?

(খ) রুই মাছের দেহে কি আঁশ থাকে?

(গ) মানুষের পদতলের চেটোয় কি চুল থাকে?

Recall Type :

৬। এককথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) মটর গাছের মূলে কেন অর্বুদ হয়?

(খ) মাগুর মাছের মুখকে ঘিরে যে শুঁড়গুলি থাকে তাদের নাম কি?

৭। শুদ্ধ করিয়া লেখ ঃ

(ক) মটর পাতা সরল। (খ) মটরের ফল কেবল এক দিকেই ফাটে।

(খ) মাগুরের লেজ কাটা।

(গ) চিবুক, কব্জি, কণীনিকা পায়ের মাথার একটি অংশের নাম।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) মটর গাছের মূলে অসংখ্য — দেখা যায়। ইহারা বাতাসের — মূলে আবদ্ধ করে।

(খ) মাছে নানারূপ — থাকাই বৈশিষ্ট্য।

(গ) — ও — পাতা বাদে মানুষের দেহের সর্বত্র — ঢাকা থাকে।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Deptt of Extension Services.
CALCUTTA-27